পুনশ্চ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

XII
Ben.
163.1

XII Ben 163.1

RAVĪNDRA-NĀTHA ṬHĀKURA, Sir

[Punascha. Poems. Bengali text. 1947.]

90375

90375

পুনশ্চ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

৯/১১/৫২

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৩৯
দ্বিতীয় সংস্করণ : ফাল্গুন ১৩৪০
পুনর্মুদ্রণ : কার্তিক ১৩৫১
পুনর্মুদ্রণ : বৈশাখ ১৩৫৪

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, বীরভূম

ভূমিকা

গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম। এই অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে, পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না। মনে আছে সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেম, তিনি স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু চেষ্টা করেননি। তখন আমি নিজেই পরীক্ষা করেছি, 'লিপিকা'র অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে। ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয়নি—বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।

তারপরে আমার অনুরোধক্রমে একবার অবনীন্দ্রনাথ এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আমার মত এই যে, তাঁর লেখাগুলি কাব্যের সীমার মধ্যে এসেছিল, কেবল ভাষাবাহুল্যের জন্যে তাতে পরিমাণ রক্ষা হয়নি। আর একবার আমি সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছি।

এই উপলক্ষ্যে একটা কথা বলবার আছে। গদ্যকাব্যে অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীনক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব, এই আমার বিশ্বাস এবং সেইদিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি। এর মধ্যে কয়েকটি কবিতা আছে তাতে মিল নেই, পদ্যছন্দ আছে, কিন্তু পদ্যের বিশেষ ভাষারীতি ত্যাগ করবার চেষ্টা করেছি। যেমন, তরে, সনে, মোর, প্রভৃতি যে-সকল শব্দ গদ্যে ব্যবহার হয় না সেগুলিকে এইসকল কবিতায় স্থান দিইনি।

২ আশ্বিন ১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উৎসর্গ

নীতু

সূচীপত্র

কবিতা		পৃষ্ঠা
কোপাই	...	১৩
নাটক	...	১৭
নূতন কাল	...	২১
খোয়াই	...	২৪
পত্র	...	২৮
পুকুরধারে	...	৩১
অপরাধী	...	৩৩
ফাঁক	...	৩৭
বাসা	...	৪১
দেখা	...	৪৫
সুন্দর	...	৪৭
শেষ দান	...	৪৯
কোমল গান্ধার	...	৫১
বিচ্ছেদ	...	৫৩
স্মৃতি	...	৫৬
ছেলেটা	...	৫৮
সহযাত্রী	...	৬৫
বিশ্বশোক	...	৬৯
শেষ চিঠি	...	৭২
বালক	...	৭৬
ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি	...	৮২
কীটের সংসার	...	৮৮
ক্যামেলিয়া	...	৯০
শালিখ	...	৯৭

কবিতা		পৃষ্ঠা
সাধারণ মেয়ে	...	৯৯
একজন লোক	...	১০৫
খেলনার মুক্তি	...	১০৭
পত্রলেখা	...	১১০
খ্যাতি	...	১১২
বাঁশি	...	১১৬
উন্নতি	...	১২০
ভীরু	...	১২৪
তীর্থযাত্রী	...	১৩০
চিররূপের বাণী	...	১৩২
শুচি	...	১৩৬
রংরেজিনি	...	১৪০
মুক্তি	...	১৪৩
প্রেমের সোনা	...	১৪৬
স্নানসমাপন	...	১৪৮
প্রথম পূজা	...	১৫১
অস্থানে	...	১৫৮
ঘরছাড়া	...	১৬০
ছুটির আয়োজন	...	১৬৩
মৃত্যু	...	১৬৫
মানবপুত্র	...	১৬৭
শিশুতীর্থ	...	১৬৯
শাপমোচন	...	১৮০
ছুটি	...	১৮৭
গানের বাসা	...	১৮৯
পয়লা আশ্বিন	...	১৯১

প্রথম ছত্রের সূচী

প্রথম ছত্র — পৃষ্ঠা

আজ এই বাদলার দিন … ৫৩
আধবুড়ো হিন্দুস্থানি … ১০৫
আমাদের কালে গোষ্ঠে যখন সাঙ্গ হল … ২১
আমার বয়সে … ৩৭
আমি অন্তঃপুরের মেয়ে … ৯৯
উপরে যাবার সিঁড়ি … ১২০
এক আছে মণিদিদি … ১০৭
একই লতাবিতান বেয়ে চামেলি আর মধুমঞ্জরী … ১৫৮
একদিকে কামিনীর ডালে … ৮৮
এল সে জর্মনির থেকে … ১৬০
কন্‌কনে ঠাণ্ডায় আমাদের যাত্রা … ১৩০
কাছে এল পূজার ছুটি … ১৬৩
কিনু গোয়ালার গলি … ১১৬
গন্ধর্ব সৌরসেন সুরলোকের সংগীতসভায় … ১৮০
গুরু রামানন্দ স্তব্ধ দাঁড়িয়ে … ১৪৮
ছেলেটার বয়স হবে বছর দশেক … ৫৮
ছেলেদের খেলার প্রাঙ্গণ … ৪৯
তুমি বল, তিনু প্রশ্রয় পায় আমার কাছে … ৩৩
তোমরা দুটি পাখি … ১৮৯
তোমাকে পাঠালুম আমার লেখা … ২৮
ত্রিলোকেশ্বরের মন্দির … ১৫১
দাও-না ছুটি … ১৮৭
দিলে তুমি সোনা-মোড়া ফাউন্টেন পেন … ১১০
দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি … ৬৯
দোতলার জানলা থেকে চোখে পড়ে … ৩১

প্রথম ছত্র		পৃষ্ঠা
নাটক লিখেছি একটি	...	১৭
নাম তার কমলা	...	৯০
নাম রেখেছি কোমল গান্ধার	...	৫১
পদ্মা কোথায় চলেছে দূর আকাশের তলায়	...	১৩
পশ্চিমে বাগান বন চষা-খেত	...	২৪
পশ্চিমে শহর	...	৫৬
প্রাঙ্গণে নামল অকালসন্ধ্যার ছায়া	..	১৩২
প্ল্যাটিনমের আঙটির মাঝখানে যেন হীরে	...	৪৭
বাজিরাও পেশোয়ার অভিষেক হবে	..	১৪৩
বাবা এসে শুধালেন	...	৮২
ভাই নিশি	...	১১২
মনে হচ্ছে, শূন্য বাড়িটা অপ্রসন্ন	...	৭২
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে	...	৪১
মরণের ছবি মনে আনি	...	১৬৫
মৃত্যুর পাত্রে খ্রীস্ট যেদিন মৃত্যুহীন প্রাণ উৎসর্গ করলেন		১৬৭
মোটা মোটা কালো মেঘ	...	৪৫
ম্যাট্রিকুলেশনে পড়ে	...	১২৪
রবিদাস চামার ঝাঁট দেয় ধুলো	...	১৪৬
রাত কত হল	...	১৬৯
রামানন্দ পেলেন গুরুর পদ	...	১৩৬
শংকরলাল দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত	...	১৪০
শালিখটার কী হল তাই ভাবি	...	৯৭
সুশ্রী নয় এমন লোকের অভাব নেই জগতে	...	৬৫
হিমের শিহর লেগেছে আজ মৃদু হাওয়ায়	...	১৯১
হিরণমাসির প্রধান প্রয়োজন রান্নাঘরে	...	৭৬

পুনশ্চ

কোপাই

পদ্মা কোথায় চলেছে দূর আকাশের তলায়,
মনে মনে দেখি তাকে।
এক পারে বালুর চর,
নির্ভীক কেননা নিঃস্ব, নিরাসক্ত,—
অন্যপারে বাঁশবন, আমবন,
পুরোনো বট, পোড়ো ভিটে,
অনেকদিনের গুঁড়ি-মোটা কাঁঠালগাছ—
পুকুরের ধারে শর্ষেখেত,
পথের ধারে বেতের জঙ্গল,
দেড়শো বছর আগেকার নীলকুঠির ভাঙা ভিত,
তার বাগানে দীর্ঘ ঝাউগাছে দিনরাত মর্মরধ্বনি।
ঐখানে রাজবংশীদের পাড়া,
ফাটল-ধরা খেতে ওদের ছাগল চরে,
হাটের কাছে টিনের ছাদওয়ালা গঞ্জ—
সমস্ত গ্রাম নির্মম নদীর ভয়ে কম্পান্বিত॥

পুরাণে প্রসিদ্ধ এই নদীর নাম,
মন্দাকিনীর প্রবাহ ওর নাড়ীতে।
ও স্বতন্ত্র। লোকালয়ের পাশ দিয়ে চলে যায়,
তাদের সহ্য করে, স্বীকার করে না।
বিশুদ্ধ তার আভিজাতিক ছন্দে
একদিকে নির্জন পর্বতের স্মৃতি, আর-একদিকে নিঃসঙ্গ
সমুদ্রের আহ্বান॥

একদিন ছিলেম ওরই চরের ঘাটে,
নিভৃতে, সবার হতে বহুদূরে।
ভোরের শুকতারাকে দেখে জেগেছি,
ঘুমিয়েছি রাতে সপ্তর্ষির দৃষ্টির সম্মুখে
নৌকার ছাদের উপর।
আমার একলা দিনরাতের নানা ভাবনার ধারে ধারে
চলে গেছে ওর উদাসীন ধারা—
পথিক যেমন চলে যায়
গৃহস্থের সুখদুঃখের পাশ দিয়ে অথচ দূর দিয়ে॥

তার পরে যৌবনের শেষে এসেছি
তরুবিরল এই মাঠের প্রান্তে।
ছায়াবৃত সাঁওতালপাড়ার পুঞ্জিত সবুজ দেখা যায় অদূরে॥

এখানে আমার প্রতিবেশিনী কোপাই নদী।
প্রাচীন গোত্রের গরিমা নেই তার।
অনার্য তার নামখানি
কতকালের সাঁওতাল নারীর হাস্যমুখর
কলভাষার সঙ্গে জড়িত।
গ্রামের সঙ্গে তার গলাগলি,
স্থলের সঙ্গে জলের নেই বিরোধ।
তার এপারের সঙ্গে ওপারের কথা চলে সহজে।
শনের খেতে ফুল ধরেছে একেবারে তার গায়ে গায়ে,
জেগে উঠেছে কচি কচি ধানের চারা।

রাস্তা যেখানে থেমেছে তীরে এসে
সেখানে ও পথিককে দেয় পথ ছেড়ে—
কলকল স্ফটিকস্বচ্ছ স্রোতের উপর দিয়ে।
অদূরে তালগাছ উঠেছে মাঠের মধ্যে,
তীরে আম জাম আমলকির ঘেঁষাঘেঁষি।

ওর ভাষা গৃহস্থপাড়ার ভাষা,—
তাকে সাধুভাষা বলে না।
জল স্থল বাঁধা পড়েছে ওর ছন্দে,
রেষারেষি নাই তরলে শ্যামলে।
ছিপ্‌ছিপে ওর দেহটি
বেঁকে বেঁকে চলে ছায়ায় আলোয়
হাততালি দিয়ে সহজ নাচে।
বর্ষায় ওর অঙ্গে অঙ্গে লাগে মাতলামি
মহুয়ামাতাল গাঁয়ের মেয়ের মতো,—
ভাঙে না, ডোবায় না,
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবর্তের ঘাঘরা
দুই তীরকে ঠেলা দিয়ে দিয়ে
উচ্চ হেসে ধেয়ে চলে।
শরতের শেষে স্বচ্ছ হয়ে আসে জল,
ক্ষীণ হয় তার ধারা,
তলার বালি চোখে পড়ে,
তখন শীর্ণ সমারোহের পাণ্ডুরতা
তাকে তো লজ্জা দিতে পারে না।

তার ধন নয় উদ্ধত, তার দৈন্য নয় মলিন,
এ দুইয়েই তার শোভা ;
যেমন নটী যখন অলংকারের ঝংকার দিয়ে নাচে
আর যখন সে নীরবে বসে থাকে ক্লান্ত হয়ে—
চোখের চাহনিতে আলস্য,
একটুখানি হাসির আভাস ঠোঁটের কোণে ॥

কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথি ক'রে নিলে,
সেই ছন্দের আপোষ হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে—
যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি।
তার ভাঙা তালে হেঁটে চলে যাবে ধনুক হাতে সাঁওতাল ছেলে ;
পার হয়ে যাবে গোরুর গাড়ি
আঁঠি আঁঠি খড় বোঝাই ক'রে ;
হাটে যাবে কুমোর
বাঁকে ক'রে হাঁড়ি নিয়ে ;
পিছন পিছন যাবে গাঁয়ের কুকুরটা ;
আর, মাসিক তিন টাকা মাইনের গুরু
ছেঁড়া ছাতি মাথায়।

১ ভাদ্র, ১৩৩৯

নাটক

নাটক লিখেছি একটি।
বিষয়টা কী বলি॥

অর্জুন গিয়েছেন স্বর্গে,
ইন্দ্রের অতিথি তিনি নন্দনবনে।
উর্বশী গেলেন মন্দারের মালা হাতে
তাঁকে বরণ করবেন ব'লে।
অর্জুন বললেন, "দেবী, তুমি দেবলোকবাসিনী,
অতিসম্পূর্ণ তোমার মহিমা,
অনিন্দিত তোমার মাধুরী,
প্রণতি করি তোমাকে।
তোমার মালা দেবতার সেবার জন্যে।"

উর্বশী বললেন, "কোনো অভাব নেই দেবলোকের,
নেই তার পিপাসা।
সে জানেই না চাইতে,
তবে কেন আমি হলেম সুন্দর।
তার মধ্যে মন্দ নেই,
তবে ভালো হওয়া কার জন্যে।
আমার মালার মূল্য নেই তার গলায়।
মর্ত্যকে প্রয়োজন আমার,
আমাকে প্রয়োজন মর্ত্যের।

তাই এসেছি তোমার কাছে,
তোমার আকাঙ্ক্ষা দিয়ে করো আমাকে বরণ,
দেবলোকের দুর্লভ সেই আকাঙ্ক্ষা,
মর্ত্যের সেই অমৃত-অশ্রুর ধারা।"

ভালো হয়েছে আমার লেখা।
ভালো হয়েছে, কথাটা কেটে দেব কি চিঠি থেকে।
কেন, দোষ হয়েছে কী।
সত্য কথাই বেরিয়েছে কলমের মুখে।
আশ্চর্য হয়েছ আমার অবিনয়ে,
বলছ, "ভালো যে হয়েইছে জানলে কী ক'রে।"
আমার উত্তর এই, নিশ্চিত নাই বা জানলেম।
এককালের ভালোটা
হয়তো হবে না অন্যকালের ভালো।
তাই তো এক নিশ্বাসে বলতে পারি,
ভালো হয়েছে।
চিরকালের সত্য নিয়ে কথা হত যদি
চুপ করে থাকতেম ভয়ে।
কত লিখেছি কতদিন,
মনে মনে বলেছি, খুব ভালো।
আজ পরম শত্রুর নামে
পারতেম যদি সেগুলি চালাতে
খুশি হতেম তবে।
এ লেখারও একদিন হয়তো হবে সেই দশা,
সেই জন্যেই, দোহাই তোমার,

অসংকোচে বলতে দাও আজকের মতো,—
এ লেখা হয়েছে ভালো ॥

এইখানটায় একটুখানি তন্দ্রা এল।
হঠাৎ বর্ষণে চারদিক থেকে ঘোলা জলের ধারা
যেমন নেমে আসে, সেইরকমটা।
তবু ঝেঁকে ঝেঁকে উঠে টলমল ক'রে কলম চলছে,
যেমনটা হয় মদ খেয়ে নাচতে গেলে।
তবু শেষ করব এ চিঠি,
কুয়াশার ভিতর দিয়েও জাহাজ যেমন চলে,
কল বন্ধ করে না ॥

বিষয়টা হচ্ছে আমার নাটক।
বন্ধুদের ফরমাশ, ভাষা হওয়া চাই অমিত্রাক্ষর।
আমি লিখেছি গদ্যে।
পদ্য হল সমুদ্র,
সাহিত্যের আদিযুগের সৃষ্টি।
তার বৈচিত্র্য ছন্দতরঙ্গে,
কলকল্লোলে।
গদ্য এল অনেক পরে।
বাঁধা ছন্দের বাইরে জমালো আসর।
সুশ্রী কুশ্রী ভালোমন্দ তার আঙিনায় এল
ঠেলাঠেলি করে।
ছেঁড়া কাঁথা আর শাল-দোশালা
এল জড়িয়ে মিশিয়ে,

সুরে বেসুরে ঝনাঝন্ ঝংকার লাগিয়ে দিল।
গর্জনে ও গানে, তাণ্ডবে ও তরল তালে
আকাশে উঠে পড়ল গদ্যবাণীর মহাদেশ।
কখনো ছাড়লে অগ্নিনিশ্বাস,
কখনো ঝরালে জলপ্রপাত।
কোথাও তার সমতল, কোথাও অসমতল;
কোথাও দুর্গম অরণ্য, কোথাও মরুভূমি।
একে অধিকার যে করবে তার চাই রাজপ্রতাপ;
পতন বাঁচিয়ে শিখতে হবে
এর নানারকম গতি অবগতি।
বাইরে থেকে এ ভাসিয়ে দেয় না স্রোতের বেগে,
অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ
গুরু লঘু নানা ভঙ্গীতে।
সেই গদ্যে লিখেছি আমার নাটক,
এতে চিরকালের স্তব্ধতা আছে,
আর চলতি কালের চাঞ্চল্য।

৯ ভাদ্র, ১৩৩৯

নূতন কাল

আমাদের কালে গোষ্ঠে যখন সাঙ্গ হল
সকালবেলার প্রথম দোহন,
ভোরবেলাকার ব্যাপারিরা
চুকিয়ে দিয়ে গেল প্রথম কেনাবেচা,
তখন কাঁচা রৌদ্রে বেরিয়েছি রাস্তায়,
ঝুড়ি হাতে হেঁকেছি আমার কাঁচা ফল নিয়ে,—
তাতে কিছু হয়তো ধরেছিল রঙ, পাক ধরেনি।
তারপর প্রহরে প্রহরে ফিরেছি পথে পথে ;
কত লোক কত বললে, কত নিলে, কত ফিরিয়ে দিলে,
ভোগ করলে দাম দিলে না, সেও কত লোক,—
সেকালের দিন হল সারা॥

কাল আপন পায়ের চিহ্ন যায় মুছে মুছে,
স্মৃতির বোঝা আমরাই বা জমাই কেন,
একদিনের দায় টানি কেন আর-একদিনের পরে,
দেনাপাওনা চুকিয়ে দিয়ে হাতে হাতে
ছুটি নিয়ে যাই-না কেন সামনের দিকে চেয়ে।
সেদিনকার উদ্বৃত্ত নিয়ে নূতন কারবার জমবে না,
তা নিলেম মেনে।
তাতে কী বা আসে যায়।
দিনের পর দিন পৃথিবীর বাসাভাড়া
দিতে হয় নগদ মিটিয়ে।

তারপর শেষদিনে দখলের জোর জানিয়ে
তালা বন্ধ করবার ব্যর্থ প্রয়াস,
কেন সেই মূঢ়তা ॥

তাই, প্রথম ঘণ্টা বাজল যেই
বেরিয়েছিলেম হিসেব চুকিয়ে দিয়ে।
দরজার কাছ পর্যন্ত এসে যখন ফিরে তাকাই
তখন দেখি, তুমি যে আছ
এ কালের আঙিনায় দাঁড়িয়ে।
তোমার সঙ্গীরা একদিন যখন হেঁকে বলবে,—
আর আমাকে নেই প্রয়োজন,
তখন ব্যথা লাগবে তোমারই মনে
এই আমার ছিল ভয়,
এই আমার ছিল আশা।
যাচাই করতে আসনি তুমি,—
তুমি দিলে গ্রন্থি বেঁধে তোমার কালে আমার কালে হৃদয় দিয়ে।
দেখলেম ঐ বড়ো বড়ো চোখের দিকে তাকিয়ে,
করুণ প্রত্যাশা তো এখনো তার পাতায় আছে লেগে ॥

তাই ফিরে আসতে হল আর-একবার।
দিনের শেষে নতুন পালা আবার করেছি শুরু
তোমারই মুখ চেয়ে,
ভালোবাসার দোহাই মেনে।
আমার বাণীকে দিলেম সাজ পরিয়ে
তোমাদের বাণীর অলংকারে;

তাকে রেখে দিয়ে গেলেম পথের ধারে পান্থশালায়,
পথিক বন্ধু, তোমারই কথা মনে করে।
যেন সময় হলে একদিন বলতে পার,—
মিটল তোমাদেরও প্রয়োজন,
লাগল তোমাদেরও মনে।
দশজনের খ্যাতির দিকে হাত বাড়াবার দিন নেই আমার।
কিন্তু, তুমি আমাকে বিশ্বাস করেছিলে প্রাণের টানে।
সেই বিশ্বাসকে কিছু পাথেয় দিয়ে যাব,
এই ইচ্ছা॥

যেন গর্ব করে বলতে পার,
আমি তোমাদেরও বটে,—
এই বেদনা মনে নিয়ে নেমেছি এই কালে—
এমন সময় পিছন ফিরে দেখি, তুমি নেই।
তুমি গেলে সেইখানেই
যেখানে আমার পুরোনো কাল অবগুণ্ঠিত মুখে চলে গেল;
যেখানে পুরাতনের গান রয়েছে চিরন্তন হয়ে।
আর, একলা আমি আজও এই নতুনের ভিড়ে বেড়াই ধাক্কা খেয়ে,
যেখানে আজ আছে কাল নেই॥

১ ভাদ্র, ১৩৩৯

খোয়াই

পশ্চিমে বাগান বন চষা-খেত
মিলে গেছে দূর বনান্তে বেগনি বাষ্পরেখায় ;
মাঝে আম জাম তাল তেঁতুলে ঢাকা
সাঁওতালপাড়া ;
পাশ দিয়ে ছায়াহীন দীর্ঘ পথ গেছে বেঁকে
রাঙা পাড় যেন সবুজ শাড়ির প্রান্তে কুটিল রেখায়।
হঠাৎ উঠেছে এক-একটা যূথভ্রষ্ট তালগাছ
দিশাহারা অনির্দিষ্টকে যেন দিক-দেখাবার ব্যাকুলতা।
পৃথিবীর একটানা সবুজ উত্তরীয়,
তারই একধারে ছেদ পড়েছে উত্তরদিকে,
মাটি গেছে ক্ষয়ে,
দেখা দিয়েছে
ঊর্মিল লাল কাঁকরের নিস্তব্ধ তোলপাড় ;
মাঝে মাঝে মরচে-ধরা কালো মাটি
মহিষাসুরের মুণ্ড যেন।
পৃথিবী আপনার একটি কোণের প্রাঙ্গণে
বর্ষাধারার আঘাতে বানিয়েছে
ছোটো ছোটো অখ্যাত খেলার পাহাড়,
বয়ে চলেছে তার তলায় তলায় নামহীন খেলার নদী ॥

শরৎকালে পশ্চিম আকাশে
সূর্যাস্তের ক্ষণিক সমারোহে
রঙের সঙ্গে রঙের ঠেলাঠেলি,—

তখন পৃথিবীর এই ধূসর ছেলেমানুষির উপরে
দেখেছি সেই মহিমা
যা একদিন পড়েছে আমার চোখে
দুর্লভ দিনাবসানে
রোহিতসমুদ্রের তীরে তীরে
জনশূন্য তরুহীন পর্বতের রক্তবর্ণ শিখরশ্রেণীতে,
রুষ্টরুদ্রের প্রলয়ভ্রূকুঞ্চনের মতো ॥

এই পথে ধেয়ে এসেছে কালবৈশাখীর ঝড়
গেরুয়া পতাকা উড়িয়ে
ঘোড়সওয়ার বর্গিসৈন্যের মতো,—
কাঁপিয়ে দিয়েছে শাল সেগুনকে,
নুইয়ে দিয়েছে ঝাউয়ের মাথা,
'হায় হায়' রব তুলেছে বাঁশের বনে,
কলাবাগানে করেছে দুঃশাসনের দৌরাত্ম্য।
ক্রন্দিত আকাশের নিচে ঐ ধূসর বন্ধুর
কাঁকরের স্তূপগুলো দেখে মনে হয়েছে
লাল সমুদ্রে তুফান উঠল,
ছিটকে পড়ছে তার শীকরবিন্দু ॥

এসেছিনু বালককালে।
ওখানে গুহাগহ্বরে,
ঝির ঝির ঝরনার ধারায়,
রচনা করেছি মনগড়া রহস্যকথা,

খেলেছি নুড়ি সাজিয়ে
নির্জন দুপুরবেলায় আপনমনে একলা ॥

তারপরে অনেক দিন হল,
পাথরের উপর নির্ঝরের মতো
আমার উপর দিয়ে
বয়ে গেল অনেক বৎসর।
রচনা করতে বসেছি একটা কাজের রূপ
ঐ আকাশের তলায় ভাঙামাটির ধারে,
ছেলেবেলায় যেমন রচনা করেছি
নুড়ির দুর্গ।
এই শালবন, এই একলা-মেজাজের তালগাছ,
ঐ সবুজ মাঠের সঙ্গে রাঙামাটির মিতালি,
এর পানে অনেক দিন যাদের সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়েছি,
যারা মন মিলিয়েছিল
এখানকার বাদলদিনে আর আমার বাদলগানে,
তারা কেউ আছে কেউ গেল চলে ॥

আমারও যখন শেষ হবে দিনের কাজ,
নিশীথরাত্রের তারা ডাক দেবে
আকাশের ওপার থেকে—
তার পরে?
তারপরে রইবে উত্তরদিকে
ঐ বুকফাটা ধরণীর রক্তিমা,

দক্ষিণদিকে চাষের খেত,
পুবদিকের মাঠে চরবে গোরু,
রাঙা মাটির রাস্তা বেয়ে
গ্রামের লোক যাবে হাট করতে।
পশ্চিমের আকাশপ্রান্তে
আঁকা থাকবে একটি নীলাঞ্জন রেখা॥

৩০ শ্রাবণ, ১৩৩৯

পত্র

তোমাকে পাঠালুম আমার লেখা,
এক-বই-ভরা কবিতা।
তারা সবাই ঘেঁষাঘেঁষি দেখা দিল
একই সঙ্গে এক খাঁচায়।
কাজেই আর সমস্ত পাবে,
কেবল পাবে না তাদের মাঝখানের ফাঁকগুলোকে।
যে অবকাশের নীল আকাশের আসরে
একদিন নামল এসে কবিতা—
সেইটেই পড়ে রইল পিছনে॥

নিশীথরাত্রের তারাগুলি ছিঁড়ে নিয়ে
যদি হার গাঁথা যায় ঠেসে
বিশ্ববেনের দোকানে
হয়তো সেটা বিকোয় মোটা দামে,—
তবু রসিকেরা বুঝতে পারে, যেন কমতি হল কিসের।
যেটা কম পড়ল সেটা ফাঁকা আকাশ
তৌল করা যায় না তাকে,
কিন্তু সেটা দরদ দিয়ে ভরা।
মনে করো, একটি গান উঠল জেগে
নীরব সময়ের বুকের মাঝখানে
একটিমাত্র নীলকান্ত মণি—
তাকে কি দেখতে হবে
গয়নার বাক্সের মধ্যে।

বিক্রমাদিত্যের সভায়
কবিতা শুনিয়েছেন কবি দিনে দিনে।
ছাপাখানার দৈত্য তখন
কবিতার সময়াকাশকে
দেয়নি লেপে কালি মাখিয়ে।
হাইড্রলিক জাঁতায়-পেষা কাব্যপিণ্ড
তলিয়ে যেত না গলায় এক-এক গ্রাসে,
উপভোগটা পুরো অবসরে উঠত রসিয়ে॥

হায় রে, কানে শোনার কবিতাকে
পরানো হল চোখে দেখার শিকল,
কবিতার নির্বাসন হল লাইব্রেরিলোকে ;
নিত্যকালের আদরের ধন
পাব্লিশরের হাটে হল নাকাল।
উপায় নেই,
জটলা-পাকানোর যুগ এটা।
কবিতাকে পাঠকের অভিসারে যেতে হয়
পটলডাঙার অম্নিবাসে চড়ে।
মন বলছে নিশ্বাস ফেলে,—
আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে।
তুমি যদি হতে বিক্রমাদিত্য—
আর, আমি যদি হতেম—কী হবে বলে।
জন্মেছি ছাপার কালিদাস হয়ে।
তোমরা আধুনিক মালবিকা,
কিনে পড় কবিতা

আরাম-কেদারায় বসে।
চোখ বুজে কান পেতে শোন না ;
শোনা হলে
কবিকে পরিয়ে দাও না বেলফুলের মালা,—
দোকানে পাঁচ শিকে দিয়েই খালাস ॥

১০ ভাদ্র, ১৩৩৯

পুকুরধারে

দোতলার জানলা থেকে চোখে পড়ে
পুকুরের একটি কোণা।
ভাদ্রমাসে কানায় কানায় জল।
জলে গাছের গভীর ছায়া টলটল করছে
সবুজ রেশমের আভায়।
তীরে তীরে কলমি শাক আর হেলঞ্চ।
ঢালু পাড়িতে সুপারি গাছক'টা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।
এ ধারের ডাঙায় করবী, সাদা রঙন, একটি শিউলি ;
দুটি অযত্নের রজনীগন্ধায় ফুল ধরেছে গরিবের মতো।
বাঁখারিবাঁধা মেহেদির বেড়া,
তার ওপারে কলা পেয়ারা নারকেলের বাগান ;
আরো দূরে গাছপালার মধ্যে একটা কোঠাবাড়ির ছাদ,
উপর থেকে শাড়ি ঝুলছে।
মাথায়-ভিজে-চাদর-জড়ানো গাখোলা মোটা মানুষটি
ছিপ ফেলে বসে আছে বাঁধা ঘাটের পৈঁঠাতে,
ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায় কেটে॥

বেলা পড়ে এল।
বৃষ্টিধোওয়া আকাশ,
বিকেলের প্রৌঢ় আলোয় বৈরাগ্যের ম্লানতা।
ধীরে ধীরে হাওয়া দিয়েছে,
টলমল করছে পুকুরের জল,
ঝিলমিল করছে বাতাবিলেবুর পাতা॥

চেয়ে দেখি আর মনে হয়,
এ যেন আর-কোনো-একটা দিনের আবছায়া ;
আধুনিকের বেড়ার ফাঁক দিয়ে
দূরকালের কার একটি ছবি নিয়ে এল মনে।
স্পর্শ তার করুণ, স্নিগ্ধ তার কণ্ঠ,
মুগ্ধ সরল তার কালো চোখের দৃষ্টি।
তার সাদা শাড়ির রাঙা-চওড়া পাড়
দুটি পা ঘিরে ঢেকে পরেছে ;
সে আঙিনাতে আসন বিছিয়ে দেয়,
সে আঁচল দিয়ে ধুলো দেয় মুছিয়ে ;
সে আম-কাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায় জল তুলে আনে,
তখন দোয়েল ডাকে সজনের ডালে,
ফিঙে লেজ দুলিয়ে বেড়ায় খেজুরের ঝোপে।
যখন তার কাছে বিদায় নিয়ে চলে আসি
সে ভালো করে কিছুই বলতে পারে না ;
কপাট অল্প একটু ফাঁক ক'রে পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে,
চোখ ঝাপসা হয়ে আসে ॥

২৫ শ্রাবণ, ১৩৩৯

অপরাধী

তুমি বল, তিনু প্রশ্রয় পায় আমার কাছে—
তাই রাগ কর তুমি।
ওকে ভালোবাসি,
তাই ওকে দুষ্টু বলে দেখি,
দোষী বলে দেখিনে,—
রাগও করি ওর 'পরে
ভালোও লাগে ওকে,
এ কথাটা মিছে নয় হয়তো॥

এক-একজন মানুষ অমন থাকে
সে লোক নেহাত মন্দ নয়,
সেইজন্যই সহজে তার মন্দটাই পড়ে ধরা।
সে হতভাগা রঙে মন্দ, কিন্তু মন্দ নয় রসে ;
তার দোষ স্তূপে বেশি,
ভারে বেশি নয় ;
তাই, দেখতে যতটা লাগে
গায়ে লাগে না তত।
মনটা ওর হালকা ছিপ্‌ছিপে নৌকো,
হুহু করে চলে যায় ভেসে ;
ভালোই বল আর মন্দই বল
জমতে দেয় না বেশিক্ষণ,—
এ পারের বোঝা ও পারে চালান করে দেয়

দেখতে দেখতে,—
ওকে কিছুই চাপ দেয় না,
তেমনি ও দেয় না চাপ ॥

স্বভাব ওর আসর-জমানো,
কথা কয় বিস্তর,
তাই, বিস্তর মিছে বলতে হয়—
নইলে ফাঁক পড়ে কথার ঠাস বুনোনিতে।
মিছেটা নয় ওর মনে,
সে ওর ভাষায়,—
ওর ব্যাকরণটা যার জানা
তার বুঝতে হয় না দেরি।
ওকে তুমি বল নিন্দুক,— তা সত্য।
সত্যকে বাড়িয়ে তুলে বাঁকিয়ে দিয়ে ও নিন্দে বানায়
যারা নিন্দে করে তার মন্দ হবে ব'লে নয়,
যারা নিন্দে শোনে তাদের ভালো লাগবে ব'লে।
তারা আছে সমস্ত সংসার জুড়ে।
তারা নিন্দের নীহারিকা,—
ও হল নিন্দের তারা,
ওর জ্যোতি তাদেরই কাছ থেকে পাওয়া।
আসল কথা, ওর বুদ্ধি আছে, নেই বিবেচনা।
তাই, ওর অপরাধ নিয়ে হাসি চলে।
যারা ভালোমন্দ বিবেচনা করে সূক্ষ্ম তৌলের মাপে
তাদের দেখে হাসি যায় বন্ধ হয়ে;
তাদের সঙ্গটা ওজনে হয় ভারি,

সয় না বেশিক্ষণ ;
দৈবে তাদের ত্রুটি যদি হয় অসাবধানে
হাঁপ ছেড়ে বাঁচে লোকে ॥

বুঝিয়ে বলি কাকে বলে অবিবেচনা ।—
মাখন লক্ষ্মীছাড়াটা সংস্কৃতর ক্লাশে
চৌকিতে লাগিয়ে রেখেছিল ভুষো ;
ছাপ লেগেছিল পণ্ডিতমশায়ের জামার পিঠে,
সে হেসেছিল, সবাই হেসেছিল
পণ্ডিতমশায় ছাড়া ।
হেড্ মাস্টার দিলেন ছেলেটাকে একবারে তাড়িয়ে ;
তিনি অত্যন্ত গম্ভীর, তিনি অত্যন্ত বিবেচক ।
তাঁর ভাবগতিক দেখে হাসি বন্ধ হয়ে যায় ॥

তিনু অপকার করে কিছু না ভেবে,
উপকার করে অনায়াসে,
কোনোটাই মনে রাখে না ।
ও ধার নেয়, খেয়াল নেই শোধ করবার ;
যারা ধার নেয় ওর কাছে
পাওনার তলব নেই তাদের দরজায় ।
মোটের উপর, ওরই লোকসান হয় বেশি ॥

তোমাকে আমি বলি, ওকে গাল দিয়ো যা খুশি,
আবার হেসো মনে মনে,—

নইলে ভুল হবে।
আমি ওকে দেখি কাছের থেকে, মানুষ ব'লে,
ভালো মন্দ পেরিয়ে।
তুমি দেখ দূরে ব'সে, বিশেষণের কাঠগড়ায় ওকে খাড়া রেখে।
আমি ওকে লাঞ্ছনা দিই তোমার চেয়ে বেশি,—
ক্ষমা করি তোমার চেয়ে বড়ো করে।
সাজা দিই, নির্বাসন দিইনে।
ও আমার কাছেই রয়ে গেল,
রাগ কোরো না তাই নিয়ে॥

৭ ভাদ্র, ১৩৩৯

ফাঁক

আমার বয়সে
মনকে বলবার সময় এল,—
কাজ নিয়ে কোরো না বাড়াবাড়ি,
ধীরে সুস্থে চলো,
যথোচিত পরিমাণে ভুলতে করো শুরু
যাতে ফাঁক পড়ে সময়ের মাঝে মাঝে।
বয়স যখন অল্প ছিল
কর্তব্যের বেড়ায় ফাঁক ছিল যেখানে সেখানে।
তখন যেমন-খুশির ব্রজধামে
ছিল বালগোপালের লীলা।
মথুরার পালা এল মাঝে,
কর্তব্যের রাজাসনে॥

আজ আমার মন ফিরেছে
সেই কাজ-ভোলার অসাবধানে।
কী কী আছে দিনের দাবি
পাছে সেটা যাই এড়িয়ে
বন্ধু তার ফর্দ রেখে যায় টেবিলে।
ফর্দটাও দেখতে ভুলি,
টেবিলে এসেও বসা হয় না—
এমনিতরো ঢিলে অবস্থা।
গরম পড়েছে ফর্দে এটা না ধরলেও

মনে আনতে বাধে না।
পাখা কোথায়,
কোথায় দার্জিলিঙের টাইম্‌টেবিল্‌টা,
এমনতরো হাঁপিয়ে ওঠবার ইশারা ছিল
থার্মোমিটারে।
তবু ছিলেম স্থির হয়ে॥

বেলা দুপুর,
আকাশ ঝাঁ ঝাঁ করছে,
ধূ ধূ করছে মাঠ,
তপ্ত বালু উড়ে যায় হুহু করে,
খেয়াল হয় না।
বনমালী ভাবে, দরজা বন্ধ করাটা
ভদ্রঘরের কায়দা,—
দিই তাকে এক ধমক।
পশ্চিমের সাশির ভিতর দিয়ে
রোদ ছড়িয়ে পড়ে পায়ের কাছে।
বেলা যখন চারটে
বেহারা এসে খবর নেয়, চিট্‌ঠি!
হাত উলটিয়ে বলি, নাঃ।
ক্ষণকালের জন্য খটকা লাগে,
চিঠি লেখা উচিত ছিল।
ক্ষণকালটা যায় পেরিয়ে,
ডাকের সময় যায় তার পিছন পিছন॥

এদিকে বাগানে পথের ধারে
টগর-গন্ধরাজের পুঁজি ফুরোয় না,
এরা ঘাটে-জটলা-করা বউদের মতো
পরস্পর হাসাহাসি ঠেলাঠেলিতে
মাতিয়ে তুলেছে কুঞ্জ আমার।
কোকিল ডেকে ডেকে সারা ;
ইচ্ছে করে তাকে বুঝিয়ে বলি,
অত একান্ত জেদ কোরো না
বনান্তরের উদাসীনকে মনে রাখবার জন্যে।
মাঝে মাঝে ভুলো, মাঝে মাঝে ফাঁক বিছিয়ে রেখো জীবনে ;
মনে রাখার মানহানি কোরো না
তাকে দুঃসহ করে ॥

মনে আনবার অনেক দিনক্ষণ আমারও আছে—
অনেক কথা, অনেক দুঃখ।
তার ফাঁকের ভিতর দিয়েই
নতুন বসন্তের হাওয়া আসে
রজনীগন্ধার গন্ধে বিষণ্ণ হয়ে ;
তারই ফাঁকের মধ্যে দিয়ে
কাঁঠালতলার ঘন ছায়া
তপ্ত মাঠের ধারে
দূরের বাঁশি বাজায় অশ্রুত মূলতানে
তারই ফাঁকে ফাঁকে দেখি,
ছেলেটা স্কুল পালিয়ে খেলা করছে
হাঁসের বাচ্ছা বুকে চেপে ধরে

পুকুরের ধারে
ঘাটের উপর একলা বসে,
সমস্ত বিকেল বেলাটা।
তারই ফাঁকের ভিতর দিয়ে দেখতে পাই
লিখছে চিঠি নূতন বধূ,
ফেলছে ছিঁড়ে, লিখছে আবার।
একটুখানি হাসি দেখা দেয় আমার মুখে,
আবার একটুখানি নিশ্বাসও পড়ে॥

১১ ভাদ্র, ১৩৩৯

বাসা

ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।
আমার পোষা হরিণে বাছুরে যেমন ভাব
তেমনি ভাব শালবনে আর মহুয়ায়।
ওদের পাতা ঝরছে গাছের তলায়,
উড়ে পড়ছে আমার জানলাতে।
তালগাছটা খাড়া দাঁড়িয়ে পূবের দিকে,
সকালবেলাকার বাঁকা রোদ্দুর
তারই চোরাই ছায়া ফেলে আমার দেয়ালে।
নদীর ধারে ধারে পায়ে চলা পথ
রাঙা মাটির উপর দিয়ে,
কুড়চির ফুল ঝরে তার ধুলোয় ;
বাতাবিলেবু-ফুলের গন্ধ
ঘনিয়ে ধরে বাতাসকে।
জারুল পলাশ মাদারে চলেছে রেশারেশি,
সজনে ফুলের ঝুরি দুলছে হাওয়ায়,
চামেলি লতিয়ে গেছে বেড়ার গায়ে গায়ে
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে॥

নদীতে নেমেছে ছোটো একটি ঘাট
লাল পাথরে বাঁধানো।
তারই এক পাশে অনেককালের চাঁপাগাছ,
মোটা তার গুঁড়ি।

পু—৬

নদীর উপরে বেঁধেছি একটি সাঁকো :
তার দুই পাশে কাঁচের টবে
জুঁই, বেল, রজনীগন্ধা, শ্বেতকরবী।
গভীর জল মাঝে মাঝে,
নিচে দেখা যায় নুড়িগুলি।
সেইখানে ভাসে রাজহংস,
আর ঢালুতটে চরে বেড়ায়
আমার পাটল রঙের গাইগোরুটি
আর মিশোল রঙের বাছুর
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে॥

ঘরের মেঝেতে ফিকে নীলরঙের জাজিম পাতা,
খয়েরি রঙের ফুল-কাটা।
দেয়াল বাসন্তী রঙের,
তাতে ঘন কালো রেখার পাড়।
একটুখানি বারান্দা পুবের দিকে,
সেইখানে বসি সূর্যোদয়ের আগেই।
একটি মানুষ পেয়েছি
তার গলায় সুর ওঠে ঝলক দিয়ে,
নটীর কঙ্কণে আলোর মতো।
পাশের কুটীরে সে থাকে,
তার চালে উঠেছে ঝুমকোলতা।
আপন মনে সে গায় যখন
তখনই পাই শুনতে,—
গাইতে বলিনে তাকে।

স্বামীটি তার লোক ভালো—
আমার লেখা ভালোবাসে,
ঠাট্টা করলে যথাস্থানে যথোচিত হাসতে জানে ;
খুব সাধারণ কথা সহজেই পারে কইতে ;
আবার হঠাৎ কোনো একদিন আলাপ করে
লোকে যাকে চোখ টিপে বলে কবিত্ব
রাত্রি এগারোটার সময় শালবনে
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে॥

বাড়ির পিছন দিকটাতে
শাকসবজির খেত।
বিঘেদুয়েক জমিতে হয় ধান।
আর আছে আমকাঁঠালের বাগিচা
আস্‌শেওড়ার বেড়া দেওয়া।
সকালবেলায় আমার প্রতিবেশিনী
গুন্‌ গুন্‌ গাইতে গাইতে মাখন তোলে দই থেকে ;
তার স্বামী যায় দেখতে খেতের কাজ
লাল টাট্টু ঘোড়ায় চ'ড়ে।
নদীর ও পারে রাস্তা,
রাস্তা ছাড়িয়ে ঘন বন ;
সেদিক থেকে শোনা যায় সাঁওতালের বাঁশি,
আর শীতকালে সেখানে বেদেরা করে বাসা
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে॥

এই পর্যন্ত।

এ বাসা আমার হয়নি বাঁধা, হবেও না।
ময়ূরাক্ষী নদী দেখিওনি কোনোদিন।
ওর নামটা শুনিনে কান দিয়ে,
নামটা দেখি চোখের উপরে—
মনে হয়, যেন ঘন নীল মায়ার অঞ্জন
লাগে চোখের পাতায়।

আর মনে হয়,
আমার মন বসবে না আর-কোথাও,
সব-কিছু থেকে ছুটি নিয়ে
চলে যেতে চায় উদাস প্রাণ
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে॥

৩ ভাদ্র, ১৩৩৯

দেখা

মোটা মোটা কালো মেঘ
ক্লান্ত পালোয়ানের দল যেন,
সমস্ত রাত বর্ষণের পর
আকাশের এক পাশে এসে জমল
ঘেঁষাঘেঁষি করে।
বাগানের দক্ষিণ সীমায় সেগুনগাছে
মঞ্জরীর ঢেউগুলোতে হঠাৎ পড়ল আলো,
চমকে উঠল বনের ছায়া।
শ্রাবণ মাসের রৌদ্র দেখা দিয়েছে
অনাহূত অতিথি,
হাসির কোলাহল উঠল
গাছে গাছে ডালে পালায়।
রোদ-পোহানো ভাবনাগুলো
ভেসে ভেসে বেড়ালো মনের দূর গগনে।
বেলা গেল অকাজে॥

বিকেলে হঠাৎ এল গুরু গুরু ধ্বনি,
কার যেন সংকেত।
এক মুহূর্তে মেঘের দল
বুক ফুলিয়ে হু হু করে ছুটে আসে
তাদের কোণ ছেড়ে।
বাঁধের জল হয়ে গেল কালো,
বটের তলায় নামল থম্‌থমে অন্ধকার।

দূর বনের পাতায় পাতায়
বেজে ওঠে ধারাপতনের ভূমিকা।
দেখতে দেখতে ঘনবৃষ্টিতে পাণ্ডুর হয়ে আসে
সমস্ত আকাশ,
মাঠ ভেসে যায় জলে।
বুড়ো বুড়ো গাছগুলো আলুথালু মাতামাতি করে
ছেলেমানুষের মতো ;
ধৈর্য থাকে না তালের পাতায়, বাঁশের ডালে।
একটু পরেই পালা হল শেষ,
আকাশ নিকিয়ে গেল কে।
কৃষ্ণপক্ষের কৃশ চাঁদ যেন রোগশয্যা ছেড়ে
ক্লান্ত হাসি নিয়ে অঙ্গনে বাহির হয়ে এল।

মন বলে, এই আমার যত দেখার টুক্‌রো
চাইনে হারাতে।
আমার সত্তর বছরের খেয়ায়
কত চলতি মুহূর্ত উঠে বসেছিল,
তারা পার হয়ে গেছে অদৃশ্যে।
তার মধ্যে দুটি-একটি কুঁড়েমির দিনকে
পিছনে রেখে যাব
ছন্দে-গাঁথা কুঁড়েমির কারুকাজে ;
তারা জানিয়ে দেবে আশ্চর্য কথাটি,—
একদিন আমি দেখেছিলেম এই সব-কিছু॥

৪ ভাদ্র, ১৩৩৯

সুন্দর

প্লাটিনমের আঙটির মাঝখানে যেন হীরে।
আকাশের সীমা ঘিরে মেঘ,
মাঝখানের ফাঁক দিয়ে রোদ্দুর আসছে মাঠের উপর।
হুহু করে বইছে হাওয়া,
পেঁপে গাছগুলোর যেন আতঙ্ক লেগেছে,
উত্তরের মাঠে নিমগাছে বেধেছে বিদ্রোহ,
তালগাছগুলোর মাথায় বিস্তর বকুনি।
বেলা এখন আড়াইটা।
ভিজে বনের ঝলমলে মধ্যাহ্ন
উত্তরদক্ষিণের জানলা দিয়ে এসে
জুড়ে বসেছে আমার সমস্ত মন॥

জানিনে কেন মনে হয়,
এই দিন দূরকালের আর-কোনো একটা দিনের মতো।
এরকম দিন মানে না কোনো দায়কে,
এর কাছে কিছুই নেই জরুরি,
বর্তমানের-নোঙর-ছেঁড়া ভেসে-যাওয়া এই দিন।
একে দেখছি যে-অতীতের মরীচিকা ব'লে
সে অতীত কি ছিল কোনোকালে কোনোখানে,
সে কি চিরযুগেরই অতীত নয়।
প্রেয়সীকে মনে হয়, সে আমার জন্মান্তরের জানা,
যে কালে স্বর্গ, যে কালে সত্যযুগ,
যে কাল সকল কালেরই ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে।

তেমনি এই যে সোনায় পান্নায় ছায়ায় আলোয় গাঁথা
অবকাশের নেশায় মন্থর আষাঢ়ের দিন
বিহ্বল হয়ে আছে মাঠের উপর ওড়না ছড়িয়ে দিয়ে,
এর মাধুরীকেও মনে হয়, আছে তবু নেই,—
এ আকাশবীণায় গৌড়সারঙের আলাপ,
সে আলাপ আসছে সর্বকালের নেপথ্য থেকে ॥

৭ ভাদ্র, ১৩৩৯

শেষ দান

ছেলেদের খেলার প্রাঙ্গণ।
শুকনো ধুলো, একটি ঘাস উঠতে পায় না।
একধারে আছে কাঞ্চন গাছ,
আপন রঙের মিল পায় না সে কোথাও।
দেখে মনে পড়ে আমাদের কালো রিট্রিভার কুকুরটা,
সে বাঁধা থাকে কোঠাবাড়ির বারান্দায়।
দূরে রান্নাঘরের চারধারে উঞ্ছবৃত্তির উৎসাহে
ঘুরে বেড়ায় দিশি কুকুরগুলো।
ঝগড়া করে, মার খায়, আর্তনাদ করে,
তবু আছে সুখে নিজেদের স্বভাবে।
আমাদের টেডি থেকে থেকে দাঁড়িয়ে ওঠে চঞ্চল হয়ে,
সমস্ত গা তার কাঁপতে থাকে,
ব্যগ্র চোখে চেয়ে দেখে দক্ষিণের দিকে,
ছুটে যেতে চায় ওদের মাঝখানে,
ঘেউ-ঘেউ ডাকতে থাকে ব্যর্থ আগ্রহে॥

তেমনি কাঞ্চন গাছ আছে একা দাঁড়িয়ে,
আপন শ্যামল পৃথিবীতে নয়,
মানুষের পায়ে-দলা গরিব ধুলোর 'পরে।
চেয়ে থাকে দূরের দিকে,
ঘাসের পটের উপর যেখানে বনের ছবি আঁকা॥

সেবার বসন্ত এল।
কে জানবে, হাওয়ার থেকে
ওর মজ্জায় কেমন করে কী বেদনা আসে।
অদূরে শালবন আকাশে মাথা তুলে
মঞ্জরী-ভরা সংকেত জানালে
দক্ষিণসাগরতীরের নবীন আগন্তুককে।
সেই উচ্ছ্বসিত সবুজ কোলাহলের মধ্যে
কোন্ চরম দিনের অদৃশ্য দূত দিল ওর দ্বারে নাড়া,
কানে কানে গেল খবর দিয়ে এই—
একদিন নামে শেষ আলো,
নেচে যায় কচি পাতার শেষ ছেলেখেলার আসরে॥

দেরি করলে না।
তার হাসিমুখের বেদনা
ফুটে উঠল ভারে ভারে
ফিকে বেগনি ফুলে।
পাতা গেল না দেখা,
যতই ঝরে, ততই ফোটে,
হাতে রাখল না কিছুই।
তার সব দান এক বসন্তে দিল উজাড় করে।
তার পরে বিদায় নিল
এই ধূসর ধূলির উদাসীনতার কাছে॥

৫ ভাদ্র, ১৩৩৯

কোমল গান্ধার

নাম রেখেছি কোমল গান্ধার,
মনে মনে।
যদি তার কানে যেত অবাক হয়ে থাকত বসে,—
বলত হেসে, মানে কী।
মানে কিছুই যায় না বোঝা, সেই মানেটাই খাঁটি।
কাজ আছে, কর্ম আছে সংসারে,
ভালো মন্দ অনেক রকম আছে—
তাই নিয়ে তার মোটামুটি সবার সঙ্গে চেনাশোনা।
পাশের থেকে আমি দেখি বসে বসে,
কেমন একটি সুর দিয়েছে চারিদিকে।
আপনাকে ও আপনি জানে না।—
যেখানে ওর অন্তর্যামীর আসন পাতা,
সেইখানে তাঁর পায়ের কাছে
রয়েছে কোন্ ব্যথাধূপের পাত্রখানি।
সেখান থেকে ধোঁয়ার আভাস চোখের উপর পড়ে,
চাঁদের উপর মেঘের মতো
হাসিকে দেয় একটুখানি ঢেকে।
গলার সুরে কী করুণা লাগে ঝাপসা হয়ে।
ওর জীবনের তানপুরা যে ওই সুরেতেই বাঁধা,
সেই কথাটি ও জানে না।
চলায় বসায় সব কাজেতেই ভৈরবী দেয় তান—
কেন যে তার পাইনে কিনারা।

তাই তো আমি নাম দিয়েছি কোমল গান্ধার,—
যায় না বোঝা, যখন চক্ষু তোলে
বুকের মধ্যে অমন ক'রে
কেন লাগায় চোখের জলের মিড় ॥

১৩ ভাদ্র, ১৩৩৯

বিচ্ছেদ

আজ এই বাদলার দিন
এ মেঘদূতের দিন নয়।
এ দিন অচলতায় বাঁধা—
মেঘ চলছে না, চলছে না হাওয়া,
টিপিটিপি বৃষ্টি
ঘোমটার মতো পড়ে আছে
দিনের মুখের উপর।
সময়ে যেন স্রোত নেই,
চারদিকে অবারিত আকাশ,
অচঞ্চল অবসর॥

যেদিন মেঘদূত লিখেছেন কবি,
সেদিন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে নীল পাহাড়ের গায়ে।
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটেছে মেঘ,
পুবে হাওয়া বয়েছে শ্যাম জম্বুবনান্তকে দুলিয়ে দিয়ে।
যক্ষনারী বলে উঠেছে,—
"মাগো, পাহাড়সুদ্ধ নিল বুঝি উড়িয়ে।"
মেঘদূত উড়ে চলে যাওয়ার বিরহ,
দুঃখের ভার পড়ল না তার 'পরে,
সেই বিরহে ব্যথার উপর মুক্তি হয়েছে জয়ী॥

সেদিনকার পৃথিবী জেগে উঠেছিল
উচ্ছল ঝরনায়, উদ্বেল নদীস্রোতে,

মুখরিত বনহিল্লোলে,
তার সঙ্গে দুলে দুলে উঠেছে
মন্দাক্রান্তা ছন্দে বিরহ র বাণী।
একদা যখন মিলনে ছিল না বাধা
তখন ব্যবধান ছিল সমস্ত বিশ্বে,
বিচিত্র পৃথিবীর বেষ্টনী পড়ে থাকত
নিভৃত বাসরকক্ষের বাইরে।
যেদিন এল বিচ্ছেদ
সেদিন বাঁধনছাড়া দুঃখ বেরোল
নদী গিরি অরণ্যের উপর দিয়ে।
কোণের কান্না মিলিয়ে গেল পথের উল্লাসে।
অবশেষে ব্যথার রূপ দেখা গেল
যে কৈলাসে যাত্রা হল শেষ॥

সেখানে অচল ঐশ্বর্যের মাঝখানে
প্রতীক্ষার নিশ্চল বেদনা।
অপূর্ণ যখন চলেছে পূর্ণের দিকে
তার বিচ্ছেদের যাত্রাপথে
আনন্দের নব নব পর্যায়।
পরিপূর্ণ অপেক্ষা করছে স্থির হয়ে ;
নিত্য পুষ্প, নিত্য চন্দ্রালোক ;
নিত্যই সে একা, সেই তো একান্ত বিরহী।
যে অভিসারিকা তারই জয়,
আনন্দে সে চলেছে কাঁটা মাড়িয়ে॥

ভুল বলা হল বুঝি।
সেও তো নেই স্থির হয়ে যে পরিপূর্ণ,
সে যে বাজায় বাঁশি, প্রতীক্ষার বাঁশি,—
স্থর তার এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে।
বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা
পদে পদে মিলেছে একই তালে।
তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে;
সমুদ্র দুলেছে আহ্বানের স্থরে॥

৭ ভাদ্র, ১৩৩৯

স্মৃতি

পশ্চিমে শহর।
তারি দূর কিনারায় নির্জনে
দিনের তাপ আগলে আছে একটা অনাদৃত বাড়ি,
চারিদিকে চাল পড়েছে ঝুঁকে।
ঘরগুলোর মধ্যে চিরকালের ছায়া উপুড় হয়ে পড়ে,
আর, চিরবন্দী পুরাতনের একটা গন্ধ।
মেঝের উপর হলদে জাজিম,
ধারে ধারে ছাপ-দেওয়া বন্দুকধারী বাঘ-মারা শিকারির মূর্তি।
উত্তরদিকে শিশুগাছের তলা দিয়ে
চলেছে সাদামাটির রাস্তা, উড়ছে ধুলো,
খররৌদ্রের গায়ে হালকা উড়নির মতো।
সামনের চরে গম অড়র ফুটি তরমুজের খেত,
দূরে ঝকমক করছে গঙ্গা,
তার মাঝে মাঝে গুন্‌টানা নৌকো—
কালির আঁচড়ে আঁকা ছবি যেন।
বারান্দায় রুপোর কাঁকন-পরা ভজিয়া
গম ভাঙছে জাঁতায়,
গান গাইছে একঘেয়ে সুরে,
গিরধারী দারোয়ান অনেকখন ধরে তার পাশে বসে আছে,
জানি না কিসের ওজরে।
বুড়ো নিমগাছের তলায় ইঁদারা,
গোরু দিয়ে জল টেনে তোলে মালি ;
তার কাকুধ্বনিতে মধ্যাহ্ন সকরুণ,

তার জলধারায় চঞ্চল ভুট্টার খেত।
গরম হাওয়ায় ঝাপসা গন্ধ আসছে আমের বোলের,
খবর আসছে মহানিমের মঞ্জরীতে মৌমাছির বসেছে মেলা।
অপরাহ্ণে শহর থেকে আসে একটি পরবাসী মেয়ে,
তাপে কৃশ পাণ্ডুবর্ণ বিষণ্ণ তার মুখ,
মৃদুস্বরে পড়িয়ে যায় বিদেশী কবির কবিতা।
নীলরঙের জীর্ণ চিকের ছায়া-মিশোনো অস্পষ্ট আলোয়
ভিজে খস্‌খসের গন্ধের মধ্যে
প্রবেশ করে সাগরপারের মানবহৃদয়ের ব্যথা।
আমার প্রথম যৌবন খুঁজে বেড়ায় বিদেশী ভাষার মধ্যে
আপন ভাষা।
প্রজাপতি যেমন ঘুরে বেড়ায়
বিলিতি মৌসুমি ফুলের কেয়ারিতে
নানা বর্ণের ভিড়ে।

৭ ভাদ্র, ১৩৩৯

ছেলেটা

ছেলেটার বয়স হবে বছর দশেক,
পরের ঘরে মানুষ,
যেমন আগাছা বেড়ে ওঠে ভাঙা বেড়ার ধারে—
মালির যত্ন নেই,
আছে আলোক বাতাস বৃষ্টি,
পোকামাকড় ধুলোবালি ;
কখনো ছাগলে দেয় মুড়িয়ে,
কখনো মাড়িয়ে দেয় গোরুতে ;
তবু মরতে চায় না, শক্ত হয়ে ওঠে,
ডাঁটা হয় মোটা,
পাতা হয় চিকন সবুজ ॥

ছেলেটা কুল পাড়তে গিয়ে গাছের থেকে পড়ে,
হাড় ভাঙে,
বুনো বিষফল খেয়ে ওর ভির্মি লাগে,
রথ দেখতে গিয়ে কোথায় যেতে কোথায় যায়,
কিছুতেই কিছু হয় না,—
আধমরা হয়েও বেঁচে ওঠে,
হারিয়ে গিয়ে ফিরে আসে
কাদা মেখে, কাপড় ছিঁড়ে ;
মার খায় দমাদম,
গাল খায় অজস্র,
ছাড়া পেলেই আবার দেয় দৌড় ॥

মরা নদীর বাঁকে দাম জমেছে বিস্তর,
বক দাঁড়িয়ে থাকে ধারে,
দাঁড়কাক বসেছে বৈঁচিগাছের ডালে,
আকাশে উড়ে বেড়ায় শঙ্খচিল,—
বড়ো বড়ো বাঁশ পুঁতে জাল পেতেছে জেলে,
বাঁশের ডগায় বসে আছে মাছরাঙা,
পাতিহাঁস ডুবে ডুবে গুগলি তোলে।
বেলা দুপুর।
লোভ হয় জলের ঝিলিমিলি দেখে;
তলায় পাতা ছড়িয়ে শেওলাগুলো দুলতে থাকে,
মাছগুলো খেলা করে।
আরো তলায় আছে নাকি নাগকন্যা?
সোনার কাঁকই দিয়ে আঁচড়ায় লম্বা চুল,
আঁকাবাঁকা ছায়া তার জলের ঢেউয়ে॥

ছেলেটার খেয়াল গেল ঐখানে ডুব দিতে,
ঐ সবুজ স্বচ্ছ জল,
সাপের চিকন দেহের মতো।
কী আছে দেখিই-না, সব তাতে এই তার লোভ।
দিল ডুব, দামে গেল জড়িয়ে—
চেঁচিয়ে উঠে খাবি খেয়ে তলিয়ে গেল কোথায়।
ডাঙায় রাখাল চরাচ্ছিল গোরু,
জেলেদের ডিঙি নিয়ে টানাটানি করে তুললে তাকে,
তখন সে নিঃসাড়।
তার পরে অনেকদিন ধরে মনে পড়েছে

চোখে কী করে সর্ষেফুল দেখে
আঁধার হয়ে আসে,
যে-মাকে কচিবেলায় হারিয়েছে
তার ছবি জাগে মনে,
জ্ঞান যায় মিলিয়ে।
ভারি মজা,
কী করে মরে সেই মস্ত কথাটা।
সাথিকে লোভ দেখিয়ে বলে—
"একবার দেখ -না ডুবে, কোমরে দড়ি বেঁধে,
আবার তুলব টেনে।"
ভারি ইচ্ছা করে জানতে ওর কেমন লাগে।
সাথি রাজি হয় না,
ও রেগে বলে, "ভীতু, ভীতু, ভীতু কোথাকার।"

বক্সিদের ফলের বাগান, সেখানে লুকিয়ে যায় জন্তুর মতো।
মার খেয়েছে বিস্তর, জাম খেয়েছে আরো অনেক বেশি।
বাড়ির লোকে বলে, "লজ্জা করে না বাঁদর?"
কেন লজ্জা।
বক্সিদের খোঁড়া ছেলে তো ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে ফল পাড়ে,
ঝুড়ি ভরে নিয়ে যায়,—
গাছের ডাল যায় ভেঙে,
ফল যায় দ'লে,
লজ্জা করে না?

একদিন পাকড়াশিদের মেজোছেলে একটা কাঁচ-পড়ানো চোঙ নিয়ে
ওকে বললে, "দেখ্‌-না ভিতর বাগে।"
দেখল নানারঙ সাজানো,
নাড়া দিলেই নতুন হয়ে ওঠে।
বললে, "দে-না ভাই, আমাকে।
তোকে দেব আমার ঘষা ঝিনুক,
কাঁচা আম ছাড়াবি মজা ক'রে,
আর দেব আমের কষির বাঁশি।"

দিল না ওকে।
কাজেই চুরি করে আনতে হল।
ওর লোভ নেই,
ও কিছু রাখতে চায় না, শুধু দেখতে চায়
কী আছে ভিতরে।
খোদন দাদা কানে মোচড় দিতে দিতে বললে,
"চুরি করলি কেন।"
লক্ষ্মীছাড়াটা জবাব করলে,
"ও কেন দিল না।"
যেন চুরির আসল দায় পাকড়াশিদের ছেলের ॥

ভয় নেই, ঘৃণা নেই ওর দেহটাতে।
কোলাব্যাঙ তুলে ধরে খপ করে ;
বাগানে আছে খোঁটা-পোঁতার এক গর্ত,
তার মধ্যে সেটা পোষে,—
পোকামাকড় দেয় খেতে।

গুবরে পোকা কাগজের বাক্সোয় এনে রাখে,
খেতে দেয় গোবরের গুটি,
কেউ ফেলে দিতে গেলে অনর্থ বাধে।
ইস্কুলে যায় পকেটে নিয়ে কাঠবিড়ালি।
একদিন একটা হেলে সাপ রাখলে মাস্টারের ডেস্কে,—
ভাবলে, দেখিই না, কী করে মাস্টারমশায়।
ডেক্‌সো খুলেই ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠে দিলেন দৌড়—
দেখবার মতো দৌড়টা॥

একটা কুকুর ছিল ওর পোষা—
কুলীনজাতের নয়,
একেবারে বঙ্গজ।
চেহারা প্রায় মনিবেরই মতো,
ব্যবহারটাও।
অন্ন জুটত না সব সময়ে,
গতি ছিল না চুরি ছাড়া;
সেই অপকর্মের মুখে তার চতুর্থ পা হয়েছিল খোঁড়া।
আর, সেই সঙ্গেই কোন্‌ কার্যকারণের যোগে
শাসনকর্তাদের শসাখেতের বেড়া গিয়েছিল ভেঙে।
মনিবের বিছানা ছাড়া কুকুরটার ঘুম হত না রাতে,
তাকে নইলে মনিবেরও সেই দশা।
একদিন প্রতিবেশীর বাড়া ভাতে মুখ দিতে গিয়ে
তার দেহান্তর ঘটল।
মরণান্তিক দুঃখেও কোনোদিন জল বেরোয়নি যে-ছেলের চোখে
দুদিন সে লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদে কেঁদে বেড়ালো;

মুখে অন্নজল রুচল না ;
বক্সিদের বাগানে পেকেছে করমচা,
চুরি করতে উৎসাহ হল না।
সেই প্রতিবেশীদের ভাগনে ছিল সাত বছরের,
তার মাথার উপর চাপিয়ে দিয়ে এল এক ভাঙা হাঁড়ি।
হাঁড়ি-চাপা তার কান্না শোনালো যেন ঘানিকলের বাঁশি ॥

গেরস্তঘরে ঢুকলেই সবাই তাকে দূর-দূর করে ;
কেবল তাকে ডেকে এনে দুধ খাওয়ায় সিধু গয়লানি।
তার ছেলেটি মরে গেছে সাত বছর হল,
বয়সে ওর সঙ্গে তিন দিনের তফাত।
ওরই মতো কালোকোলো,
নাকটা ওইরকম চ্যাপটা।
ছেলেটার নতুন নতুন দৌরাত্ম্য এই গয়লানি মাসির 'পরে—
তার বাঁধা গোরুর দড়ি দেয় কেটে,
তার ভাঁড় রাখে লুকিয়ে,
খয়েরের রঙ লাগিয়ে দেয় তার কাপড়ে—
দেখি-না কী হয়, তারই বিবিধরকম পরীক্ষা।
তার উপদ্রবে গয়লানির স্নেহ ওঠে ঢেউ খেলিয়ে।
তার হয়ে কেউ শাসন করতে এলে
সে পক্ষ নেয় ঐ ছেলেটারই ॥

অম্বিকে মাস্টার আমার কাছে দুঃখ করে গেল,—
"শিশুপাঠে আপনার লেখা কবিতাগুলো

পড়তে ওর মন লাগে না কিছুতেই,
এমন নিরেট বুদ্ধি।
পাতাগুলো দুষ্টুমি করে কেটে রেখে দেয় ;
বলে ইঁদুরে কেটেছে।
এতবড়ো বাঁদর।”
আমি বললুম, “সে ত্রুটি আমারই ;
থাকত ওর নিজের জগতের কবি
তাহলে গুবরে পোকা এত স্পষ্ট হত তার ছন্দে
ও ছাড়তে পারত না।
কোনোদিন ব্যাঙের খাঁটি কথাটি কি পেরেছি লিখতে,
আর সেই নেড়ি কুকুরের ট্রাজেডি।”

২৮ শ্রাবণ, ১৩৩৯

সহযাত্রী

সুশ্রী নয় এমন লোকের অভাব নেই জগতে—
এ মানুষটি তার চেয়েও বেশি, এ অদ্ভুত।
খাপছাড়া টাক সামনের মাথায়,
ফুরফুরে চুল কোথাও সাদা কোথাও কালো।
ছোটো ছোটো দুই চোখে নেই রোঁওয়া ;
ভ্রূ কুঁচকিয়ে কী দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে,
তার দেখাটা যেন চোখের উঞ্ছবৃত্তি।
যেমন উঁচু তেমনি চওড়া নাকটা,
সমস্ত মুখের সে বারো-আনি অংশীদার।
কপালটা মস্ত,—
তার উত্তরদিগন্তে নেই চুল, দক্ষিণদিগন্তে নেই ভুরু।
দাড়িগোঁফ-কামানো মুখে
অনাবৃত হয়েছে বিধাতার শিল্পরচনার অবহেলা॥

কোথায় অলক্ষ্যে পড়ে আছে আলপিন, টেবিলের কোণে,
তুলে নিয়ে সে বিঁধিয়ে রাখে জামায়—
তাই দেখে মুখ ফিরিয়ে মুচকে হাসে জাহাজের মেয়েরা।
পার্সেল-বাঁধা টুকরো ফিতেটা সংগ্রহ করে মেঝের থেকে,
গুটিয়ে গুটিয়ে তাতে লাগায় গ্রন্থি ;
ফেলে-দেওয়া খবরের কাগজ ভাঁজ করে রাখে টেবিলে।
আহারে অত্যন্ত সাবধান ;
পকেটে থাকে হজমি গুঁড়ো,

খেতে বসেই সেটা খায় জলে মিশিয়ে ;
খাওয়ার শেষে খায় হজমি বড়ি

স্বল্পভাষী, কথা যায় বেধে ;
যা বলে, মনে হয়, বোকার মতো।
ওর সঙ্গে যখন কেউ পলিটিক্স্ বলে
ও থাকে চুপচাপ ; কিছু বুঝল কি না বোঝা যায় না।
চলেছি একসঙ্গে সাতদিন এক জাহাজে।
অকারণে সকলে বিরক্ত ওর 'পরে ;
ওকে ব্যঙ্গ করে আঁকে ছবি,
হাসে তাই নিয়ে পরস্পর।
ওর নামে অত্যুক্তি বেড়ে চলেছে কেবলই ;
ওকে দিনে দিনে মুখে মুখে রচনা করে তুলছে সবাই।
বিধির রচনায় ফাঁক থাকে,
থাকে কোথাও কোথাও অস্ফুটতা।
এরা ভরিয়ে তোলে এদের রচনা দৈনিক রাবিশ দিয়ে ;
খাঁটি সত্যের মতো চেহারা হয়,
নিজেরা বিশ্বাস করে।
সবাই ঠিক করে রেখেছে, ও দালাল ;
কেউ বা বলে, রবারের কুঠির মেজো ম্যানেজার।
বাজি রাখা চলছে আন্দাজ নিয়ে ॥

সবাই ওকে পাশ কাটিয়ে চলে,
সেটা ওর সয়ে গেছে আগে থাকতেই।

চুরোট খাওয়ার ঘরে জুয়ো খেলে যাত্রীরা,
ও তাদের এড়িয়ে চলে যায় ;
তারা ওকে গাল দেয় মনে মনে ;
বলে কৃপণ, বলে ছোটোলোক ॥

ও মেশে চাটগাঁয়ের খালাসিদের সঙ্গে ।
তারা কয় তাদের ভাষায় ;
ও বলে কী ভাষা কে জানে,
বোধ করি ওলন্দাজি ।
সকালে রবারের নল নিয়ে তারা ডেক ধোয় ;
ও তাদের মধ্যে গিয়ে লাফালাফি করে,
তারা হাসে ।
ওদের মধ্যে ছিল এক অল্পবয়সের ছেলে—
শামলা রঙ, কালো চোখ, ঝাঁকড়া চুল,
ছিপছিপে গড়ন ;
ও তাকে এনে দেয় আপেল, কমলালেবু ;
তাকে দেখায় ছবির বই ।
যাত্রীরা রাগ করে য়ুরোপের অসম্মানে ॥

জাহাজ এল শিঙাপুরে ।
খালাসিদের ডেকে ও তাদের দিল সিগারেট,
আর দশটা করে টাকার নোট ।
ছেলেটাকে দিলে একটা সোনা-বাঁধানো ছড়ি ।

কাপ্তেনের কাছে বিদায় নিয়ে
তড়বড় করে নেমে গেল ঘাটে।
তখন তার আসল নাম হয়ে গেল জানাজানি ;
যারা চুরোট-ফোঁকার ঘরে তাস খেলত
হায়, হায় করে উঠল তাদের মন ॥

১১ ভাদ্র, ১৩৩৯

বিশ্বশোক

দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি,—
লজ্জা দিয়ো না।
সকলের নয় যে-আঘাত
ধোরো না সবার চোখে।
ঢেকো না মুখ অন্ধকারে ;
রেখো না দ্বারে আগল দিয়ে।
জ্বালো সকল রঙের উজ্জ্বল বাতি ;
কৃপণ হোয়ো না॥

অতি বৃহৎ বিশ্ব—
অম্লান তার মহিমা,
অক্ষুব্ধ তার প্রকৃতি ;
মাথা তুলেছে দুর্দর্শ সূর্যলোকে,
অবিচলিত অকরুণ দৃষ্টি তার অনিমেষ ;
অকম্পিত বক্ষ প্রসারিত
গিরি নদী প্রান্তরে।
আমার সে নয়,
সে অসংখ্যের।
বাজে তার ভেরী সকল দিকে,
জ্বলে অনিভৃত আলো,
দোলে পতাকা মহাকাশে।

তার সমুখে লজ্জা দিয়ো না,—
আমার ক্ষতি, আমার ব্যথা
তার সমুখে কণার কণা॥

এই ব্যথাকে আমার বলে ভুলব যখনই
তখনই সে প্রকাশ পাবে বিশ্বরূপে।
দেখতে পাব, বেদনার বন্যা নামে কালের বুকে
শাখাপ্রশাখায়;
ধায় হৃদয়ের মহানদী
সব মানুষের জীবনস্রোতে ঘরে ঘরে।
অশ্রুধারার ব্রহ্মপুত্র
উঠছে ফুলে ফুলে
তরঙ্গে তরঙ্গে;
সংসারের কূলে কূলে
চলে তার বিপুল ভাঙাগড়া
দেশে দেশান্তরে।
চিরকালের সেই বিরহতাপ,
চিরকালের সেই মানুষের শোক,
নামল হঠাৎ আমার বুকে;
এক প্লাবনে থর্‌থরিয়ে কাঁপিয়ে দিল
পাঁজরগুলো;
সব ধরণীর কান্নার গর্জনে
মিলে গিয়ে চলে গেল অনন্তে,
কী উদ্দেশে কে তা জানে॥

আজকে আমি ডেকে বলি লেখনীকে,
লজ্জা দিয়ো না।
কূল ছাপিয়ে উঠুক তোমার দান।
দাক্ষিণ্যে তোমার
ঢাকা পড়ুক অন্তরালে
আমার আপন ব্যথা।
ক্রন্দন তার হাজার তানে মিলিয়ে দিয়ো
বিশাল বিশ্বসুরে ॥

১১ ভাদ্র, ১৩৩৯

শেষ চিঠি

মনে হচ্ছে, শূন্য বাড়িটা অপ্রসন্ন—
অপরাধ হয়েছে আমার,
তাই আছে মুখ ফিরিয়ে।
ঘরে ঘরে বেড়াই ঘুরে,
আমার জায়গা নেই,—
হাঁপিয়ে বেরিয়ে চলে আসি।
এ বাড়ি ভাড়া দিয়ে চলে যাব দেরাদুনে।
অমলির ঘরে ঢুকতে পারিনি বহুদিন,
মোচড় যেন দিত বুকে।
ভাড়াটে আসবে, ঘর দিতেই হবে সাফ ক'রে,
তাই খুললেম ঘরের তালা॥

একজোড়া আগ্রার জুতো,
চুল বাঁধবার চিরুনি, তেল, এসেন্সের শিশি।
শেলফে তার পড়বার বই,
ছোটো হার্মোনিয়ম।
একটা অ্যাল্‌বাম,
ছবি কেটে কেটে জুড়েছে তার পাতায়।
আলনায় তোয়ালে, জামা,
খদ্দরের শাড়ি।
ছোটো কাঁচের আলমারিতে
নানারকমের পুতুল,
শিশি, খালি পাউডারের কৌটো।

চুপ করে বসে রইলেম চৌকিতে
টেবিলের সামনে।
লাল চামড়ার বাক্স,
ইস্কুলে নিয়ে যেত সঙ্গে।
তার থেকে খাতাটি নিলেম তুলে,
আঁক কষবার খাতা।
ভিতর থেকে পড়ল একটি আখোলা চিঠি
আমারই ঠিকানা লেখা,
অমলির কাঁচা হাতের অক্ষরে॥

শুনেছি ডুবে মরবার সময়
অতীতকালের সব ছবি
একমুহূর্তে দেখা দেয় নিবিড় হয়ে—
চিঠিখানি হাতে নিয়ে তেমনি পড়ল মনে
অনেক কথা এক নিমেষে॥

অমলার মা যখন গেলেন মারা
তখন ওর বয়স ছিল সাত বছর।
কেমন একটা ভয় লাগল মনে,
ও বুঝি বাঁচবে না বেশি দিন।
কেননা, বড়ো করুণ ছিল ওর মুখ,
যেন অকালবিচ্ছেদের ছায়া
ভাবীকাল থেকে উলটে এসে পড়েছিল
ওর বড়ো বড়ো কালো চোখের উপরে।
সাহস হত না, ওকে সঙ্গছাড়া করি।

কাজ করছি আপিসে বসে,
হঠাৎ হত মনে,
যদি কোনো আপদ ঘটে থাকে ॥

বাঁকিপুর থেকে মাসি এল ছুটিতে ;
বললে, "মেয়েটার পড়াশুনো হল মাটি—
মুর্খু মেয়ের বোঝা বইবে কে
আজকালকার দিনে।"
লজ্জা পেলেম কথা শুনে তার,
বললেম, "কালই দেব ভরতি করে বেথুনে।"

ইস্কুলে তো গেল,
কিন্তু ছুটির দিন বেড়ে যায় পড়ার দিনের চেয়ে।
কতদিন স্কুলের বাস্‌ অমনি যেত ফিরে।
সে-চক্রান্তে বাপেরও ছিল যোগ ॥

ফিরে বছর মাসি এল ছুটিতে ;
বললে, "এমন করে চলবে না।
নিজে ওকে যাব নিয়ে,
বোর্ডিঙে দেব বেনারসের স্কুলে,—
ওকে বাঁচানো চাই বাপের স্নেহ থেকে।"
মাসির সঙ্গে গেল চলে।
অশ্রুহীন অভিমান
নিয়ে গেল বুক ভরে
যেতে দিলেম বলে ॥

বেরিয়ে পড়লেম বদ্রিনাথের তীর্থযাত্রায়,—
নিজের কাছ থেকে পালাবার ঝোঁকে।
চার মাস খবর নেই।
মনে হল, গ্রন্থি হয়েছে আলগা
গুরুর কৃপায়।
মেয়েকে মনে মনে সঁপে দিলেম দেবতার হাতে,—
বুকের থেকে নেমে গেল বোঝা॥

চার মাস পরে এলেম ফিরে।
ছুটেছিলেম অমলিকে দেখতে কাশীতে—
পথের মধ্যে পেলেম চিঠি—
কী আর বলব,
দেবতাই তাকে নিয়েছে॥

যাক সে-সব কথা।
অমলার ঘরে বসে সেই আখোলা চিঠি খুলে দেখি,
তাতে লেখা,—
"তোমাকে দেখতে বড্‌ডো ইচ্ছে করছে।"
আর কিছুই নেই।

৩১ শ্রাবণ, ১৩৩৯

বালক

হিরণমাসির প্রধান প্রয়োজন রান্নাঘরে।
দুটি ঘড়া জল আনতে হয় দিঘি থেকে—
তার দিঘিটা ঐ দুই ঘড়ারই মাপে
রান্নাঘরের পিছনে বাঁধা দরকারের বাঁধনে॥

এদিকে তার মা-মরা বোনপো,
গায়ে যে রাখে না কাপড়,
মনে যে রাখে না সদুপদেশ,
প্রয়োজন যার নেই কোনো কিছুতেই,
সমস্ত দিঘির মালেক সেই লক্ষ্মীছাড়াটা।
যখন খুশি ঝাঁপ দিয়ে পড়ে জলে,
মুখে জল নিয়ে আকাশে ছিটোতে ছিটোতে সাঁতার কাটে,
ছিনিমিনি খেলে ঘাটে দাঁড়িয়ে,
কঞ্চি নিয়ে করে মাছ-ধরা খেলা,
ডাঙায় গাছে উঠে পাড়ে জামরুল—
খায় যত ছড়ায় তার বেশি।
দশ-আনির টাকপড়া মোটা জমিদার—
লোকে বলে দিঘির স্বত্ব তারই।
বেলা দশটায় সে চাপড়ে চাপড়ে তেল মাখে বুকে পিঠে;
ঝপ করে দুটো ডুব দিয়ে নেয়;
বাঁশবনের তলা দিয়ে দুর্গা নাম করতে করতে চলে ঘরে;
সময় নেই, জরুরি মকর্দমা।
দিঘিটা আছে তার দলিলে, নেই তার জগতে।

আর, ছেলেটার দরকার নেই কিছুতেই ;
তাই সমস্ত বনবাদাড় খালবিল তারই,
নদীর ধার, পোড়ো জমি, ডুবো নৌকো, ভাঙা মন্দির,
তেঁতুলগাছের সবার উঁচু ডালটা।
জামবাগানের তলায় চরে ধোবাদের গাধা ;
ছেলেটা তার পিঠে চড়ে,
ছড়ি হাতে জমায় ঘোড়দৌড়।
ধোবাদের গাধাটা আছে কাজের গরজে,
ছেলেটার নেই কোনো দরকার,
তাই জন্তুটা তার চার পা নিয়ে সমস্তটা তারই,
যাই বলুন-না জজসাহেব।
বাপ-মা চায় পড়ে শুনে হবে সে সদর-আলা ;
সর্দারপোড়ো ওকে টেনে নামায় গাধার থেকে,
হেঁচড়ে আনে বাঁশবন দিয়ে,
হাজির করে পাঠশালায়।
মাঠে ঘাটে হাটে বাটে জলে স্থলে তার স্বরাজ ;
হঠাৎ দেহটাকে ঘিরলে চার দেয়ালে,
মনটাকে আঠা দিয়ে এঁটে দিলে
পুঁথির পাতার গায়ে॥

আমিও ছিলেম একদিন ছেলেমানুষ।
আমার জন্যেও বিধাতা রেখেছিলেন গড়ে
অকর্মণ্যের অপ্রয়োজনের জল স্থল আকাশ।
তবু ছেলেদের সেই মস্ত বড়ো জগতে
মিলল না আমার জায়গা।

আমার বাসা অনেক কালের পুরোনো বাড়ির
কোণের ঘরে ;
বাইরে যাওয়া মানা।
সেখানে চাকর পান সাজে, দেয়ালে মোছে হাত,
গুন গুন ক'রে গায় মধুকানের গান।
শানবাঁধানো মেজে, খড়খড়ে-দেওয়া জানালা।
নিচে ঘাটবাঁধানো পুকুর, পাঁচিল ঘেঁষে নারকেলগাছ।
জটাধারী বুড়ো বট মোটা মোটা শিকড়ে
আঁকড়ে ধরেছে পুব ধারটা।
সকাল থেকে নাইতে আসে পাড়ার লোকে,
বিকেলের পড়ন্ত রোদে ঝিকিমিকি জলে
ভেসে বেড়ায় পাতিহাঁসগুলো,
পাখা সাফ করে ঠোঁট দিয়ে মেজে ॥

প্রহরের পর কাটে প্রহর।
আকাশে ওড়ে চিল ;
থালা বাজিয়ে যায় পুরোনো কাপড়ওয়ালা ;
বাঁধানো নালা দিয়ে গঙ্গার জল এসে পড়ে পুকুরে।
পৃথিবীতে ছেলেরা যে খোলা জগতের যুবরাজ
আমি সেখানে জন্মেছি গরিব হয়ে।
শুধু কেবল
আমার খেলা ছিল মনের ক্ষুধায়, চোখের দেখায়,
পুকুরের জলে, বটের শিকড়জড়ানো ছায়ায়,
নারকেলের দোদুল ডালে, দূর বাড়ির রোদপোহানো ছাদে।
আশোকবনে এসেছিল হনুমান,
সেদিন সীতা পেয়েছিলেন নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের খবর।

আমার হনুমান আসত বছরে বছরে আষাঢ় মাসে
আকাশ কালো করে
সজল নবনীল মেঘে।
আনত তার মেদুর কণ্ঠে দূরের বার্তা
যে দূরের অধিকার থেকে আমি নির্বাসিত।
ইমারত-ঘেরা ক্লিষ্ট যে আকাশটুকু
তাকিয়ে থাকত একদৃষ্টে আমার মুখে
বাদলের দিনে গুরুগুরু ক'রে তার বুক উঠত দুলে।
বটগাছের মাথা পেরিয়ে কেশর ফুলিয়ে দলে দলে
মেঘ জুটত ডানাওয়ালা কালো সিংহের মতো।
নারকেল-ডালের সবুজ হত নিবিড়,
পুকুরের জল উঠত শিউরে শিউরে।
যে চাঞ্চল্য শিশুর জীবনে রুদ্ধ ছিল
সেই চাঞ্চল্য বাতাসে বাতাসে, বনে বনে।
পুবদিকের ওপার থেকে বিরাট এক ছেলেমানুষ
ছাড়া পেয়েছে আকাশে,
আমার সঙ্গে সে সাথি পাতালে॥

বৃষ্টি পরে ঝমাঝম।
একে একে
পুকুরের পৈঁঠা যায় জলে ডুবে।
আরো বৃষ্টি, আরো বৃষ্টি, আরো বৃষ্টি।
রাত্তির হয়ে আসে, শুতে যাই বিছানায়,
খোলা জানলা দিয়ে গন্ধ পাই ভিজে জঙ্গলের।

উঠোনে একহাঁটু জল,
ছাদের নালার মুখ থেকে জলে পড়ছে জল মোটা ধারায়।
ভোরবেলায় ছুটেছি দক্ষিণের জানলায় ;
পুকুর গেছে ভেসে।
জল বেরিয়ে চলেছে কলকল করে বাগানের উপর দিয়ে,
জলের উপর বেলগাছগুলোর ঝাঁকড়া মাথা জেগে থাকে।
পাড়ার লোকে হৈ হৈ করে এসেছে
গামছা দিয়ে ধুতির কোঁচা দিয়ে মাছ ধরতে।
কাল পর্যন্ত পুকুরটা ছিল আমারি মতো বাঁধা ;
এবেলা ওবেলা তার উপরে পড়ত গাছের ছায়া,
উড়ো মেঘ জলে বুলিয়ে যেত ক্ষণিকের ছায়াতুলি,
বটের ডালের ভিতর দিয়ে যেন সোনার পিচকারিতে
ছিটকে পড়ত তার উপরে আলো,
পুকুরটা চেয়ে থাকত আকাশে ছল্‌ছলে দৃষ্টিতে।
আজ তার ছুটি, কোথায় সে চলল খ্যাপা
গেরুয়াপরা বাউল যেন।
পুকুরের কোণে নৌকোটি
দাদারা চড়ে বসল ভাসিয়ে দিয়ে,
গেল পুকুর থেকে গলির মধ্যে,
গলির থেকে সদর রাস্তায়,
তার পরে কোথায় জানিনে। বসে বসে ভাবি ॥

বেলা বাড়ে।
দিনান্তের ছায়া মেশে মেঘের ছায়ায়,
তার সঙ্গে মেশে পুকুরের জলে বটের ছায়ার কালিমা।

সন্ধে হয়ে এল।

বাতি জ্বলল ঝাপসা আলোয় রাস্তার ধারে ধারে,
ঘরে জ্বলেছে কাঁচের সেজে মিটমিটে শিখা ;
ঘোর অন্ধকারে একটু একটু দেখা যায়,
দুলছে নারকেলের ডাল,
ভূতের ইশারা যেন।
গলির পারে বড়ো বাড়িতে সব দরজা বন্ধ,
আলো মিট্‌মিট করে দুই-একটা জানলা দিয়ে
চেয়ে থাকা ঘুমন্ত চোখের মতো।
তার পরে কখন আসে ঘুম,
রাত দুটোর সময় স্বরূপ সর্দার নিষুত রাতে
বারান্দায় বারান্দায় হাঁক দিয়ে যায় চলে॥

বাদলের দিনগুলো বছরে বছরে তোলপাড় করেছে আমার মন ;
আজ তারা বছরে বছরে নাড়া দেয় আমার গানের সুরকে।
শালের পাতায় পাতায় কোলাহল,
তালের ডালে ডালে করতালি,
বাঁশের দোলাদুলি বনে বনে,
ছাতিমগাছের থেকে মালতীলতা
ঝরিয়ে দেয় ফুল।
আর, সেদিনকার আমারি মতো অনেক ছেলে আছে ঘরে ঘরে,
লাঠাইয়ের সুতোয় মাখাচ্ছে আঠা,
তাদের মনের কথা তারাই জানে॥

২ ভাদ্র, ১৩৩৯

ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি

বাবা এসে শুধালেন,
“কী করছিস, সুনি।
কাপড় কেন তুলিস বাক্সে, যাবি কোথায় ?”
সুনৃতার ঘর তিনতলায়।
দক্ষিণ দিকে দুই জানলা,
সামনে পালঙ্ক,
বিছানা লক্ষ্ণৌছিটে ঢাকা।
অন্য দেয়ালে লেখবার টেবিল,
তার কোণে মায়ের ফোটোগ্রাফ,
তিনি গেছেন মারা।
বাবার ছবি দেয়ালে,
ফ্রেমে জড়ানো ফুলের মালা।
মেঝেতে লাল শতরঞ্চে
শাড়ি শেমিজ ব্লাউজ
মোজা রুমাল ছড়াছড়ি।
কুকুরটা কাছ ঘেঁষে লেজ নাড়ছে,
ঠেলা দিচ্ছে কোলে থাবা তুলে,
ভেবে পাচ্ছে না কিসের আয়োজন,
ভয় হচ্ছে পাছে ওকে ফেলে রেখে আবার যায় কোথাও।
ছোটো বোন শমিতা বসে আছে হাঁটু উঁচু করে,
বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে।
চুল বাঁধা হয়নি,
চোখ দুটি রাঙা, কান্নার অবসানে॥

চুপ করে রইল সুনৃতা ;
মুখ নিচু করে সে কাপড় গোছায়,
হাত কাঁপে।
বাবা আবার বললেন,
"সুনি, কোথাও যাবি নাকি।"
সুনৃতা শক্ত করে বললে, "তুমি তো বলেইছ,
এ-বাড়িতে হতে পারে না আমার বিয়ে,
আমি যাব অনুদের বাসায়।"
শমিতা বললে, "ছি ছি, দিদি, কী বলছ।"
বাবা বললেন, "ওরা যে মানে না আমাদের মত।"
"তবু ওদের মতই যে আমাকে মানতে হবে চিরদিন—"
এই বলে সুনি সেফটিপিন ভরে রাখলে লেফাফায়।
দৃঢ় ওর কণ্ঠস্বর, কঠিন ওর মুখের ভাব,
সংকল্প অবিচলিত।
বাবা বললেন, "অনিলের বাপ জাত মানে,
সে কি রাজি হবে।"
সগর্বে বলে উঠল সুনৃতা,—
"চেন না তুমি অনিলবাবুকে,
তাঁর জোর আছে পৌরুষের, তাঁর মত তাঁর নিজের।"
দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাবা চলে গেলেন ঘর থেকে ;
শমিতা উঠে তাঁকে জড়িয়ে ধরলে,
বেরিয়ে গেল তাঁর সঙ্গে॥

বাজল দুপুরের ঘণ্টা।
সকাল থেকে খাওয়া নেই সুনৃতার ;

শমিতা একবার এসেছিল ডাকতে ;
ও বললে, খাবে বন্ধুর বাড়ি গিয়ে।
মা-মরা মেয়ে, বাপের আদুরে,
মিনতি করতে আসছিলেন তিনি ;
শমিতা পথ আগলিয়ে বললে,
"কক্‌খনো যেতে পারবে না বাবা,
ও না খায় তো নেই খেল।"

জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে
দেখলে সুনৃতা রাস্তার দিকে,
এসেছে অনুদের গাড়ি।
তাড়াতাড়ি চুলটা আঁচড়িয়ে
ব্রোচ্‌টা লাগাচ্ছে যখন কাঁধে,
শমি এসে বললে, "এই নাও তাদের চিঠি।"
ব'লে ফেলে দিলে ছুঁড়ে ওর কোলে।
সুনৃতা পড়লে চিঠিখানা,
মুখ হয়ে গেল ফ্যাকাসে,
বসে পড়ল তোরঙ্গের উপর।
চিঠিতে আছে,—
"বাবার মত করতে পারব নিশ্চিত ছিল মনে,
হল না কিছুতেই,
কাজেই—" ॥

বাজল একটা।
সুনি চুপ করে ব'সে, চোখে জল নেই।

রামচরিত বললে এসে,
“মোটর দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ।”
সুনি বললে, “যেতে বলে দে।”
কুকুরটা কাছে এসে বসে রইল চুপ করে।
বাবা বুঝলেন;
প্রশ্ন করলেন না,
বললেন ওর মাথায় হাত বুলিয়ে,
“চল্ সুনি, হোসেঙ্গাবাদে, তোর মামার ওখানে।”

কাল বিয়ের দিন।
অনিল জিদ করেছিল, হবে না বিয়ে।
মা ব্যথিত হয়ে বলেছিল, “থাক্-না।”
বাপ বললে, “পাগল নাকি।”
ইলেক্‌ট্রিক বাতির মালা খাটানো হচ্ছে বাড়িতে,
সমস্তদিন বাজছে সানাই।
হুহু করে উঠছে অনিলের মনটা॥

তখন সন্ধ্যা সাতটা।
সুনিদের বউবাজারের বাড়ির একতলায়
ডাবাহুঁকো বাঁ হাতে ধরে তামাক খাচ্ছে
কৈলেস সরকার,
আর তালপাতার পাখায় বাতাস চলছে ডান হাতে,
বেহারাকে ডেকেছে পা টিপে দেবে।

কালিমাখা ময়লা জাজিমে কাগজপত্র রাশ-করা
জ্বলছে একটা কেরোসিন লণ্ঠন ॥

হঠাৎ অনিল এসে উপস্থিত।
কৈলেস শশব্যস্ত উঠে দাঁড়ালো
শিথিল কাছাকোঁচা সামলিয়ে।
অনিল বললে,
"পার্বনিটা ভুলেছিলেম গোলেমালে,
তাই এসেছি দিতে।"
তার পরে বাধো-বাধো গলায় বললে,
"অমনি দেখে যাব তোমাদের সুনিদিদির ঘরটা"

গেল ঘরে।
খাটের উপর রইল বসে মাথায় হাত দিয়ে।
কিসের একটা অস্পষ্ট গন্ধ,
মূর্ছিতের নিশ্বাসের মতো।
সে গন্ধ চুলের না শুকনো ফুলের
না শূন্য ঘরে সঞ্চিত বিজড়িত স্মৃতির—
বিছানায়, চৌকিতে, পর্দায়।
সিগারেট ধরিয়ে টানল কিছুক্ষণ,
ছুঁড়ে ফেলে দিল জানলার বাইরে।
টেবিলের নিচে থেকে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িটা
নিল কোলে তুলে।
ধক্ করে উঠল বুকের মধ্যে ;
দেখলে, ঝুড়িভরা রাশিরাশি ছেঁড়া চিঠি—

ফিকে নীল রঙের কাগজে
অনিলেরই হাতে লেখা।
তার সঙ্গে টুকরো-টুকরো ছেঁড়া একটা ফোটোগ্রাফ।
আর ছিল বছর চার আগেকার
দুটি ফুল, লাল ফিতের বাঁধা
মেডেন-হেয়ার পাতার সঙ্গে,
শুকনো প্যান্‌সি আর ভায়োলেট॥

২৮ শ্রাবণ, ১৩৩৯

কীটের সংসার

একদিকে কামিনীর ডালে
মাকড়সা শিশিরের ঝালর দুলিয়েছে,
আর-এক দিকে বাগানে রাস্তার ধারে
লাল মাটির কণা-ছড়ানো
পিঁপড়ের বাসা।
যাই আসি, তারি মাঝখান দিয়ে
সকালে বিকালে।
আনমনে দেখি, শিউলিগাছে কুঁড়ি ধরেছে,
টগর গেছে ফুলে ছেয়ে।
বিশ্বের মাঝে মানুষের সংসারটুকু
দেখতে ছোটো, তবু ছোটো তো নয়।
তেমনি ঐ কীটের সংসার।
ভালো করে চোখে পড়ে না,
তবু সমস্ত সৃষ্টির কেন্দ্রে আছে ওরা।
কত যুগ থেকে অনেক ভাবনা ওদের,
অনেক সমস্যা, অনেক প্রয়োজন—
অনেক দীর্ঘ ইতিহাস।
দিনের পর দিন, রাতের পর রাত
চলেছে প্রাণশক্তির দুর্বার আগ্রহ।
মাঝখান দিয়ে যাই আসি,
শব্দ শুনিনে ওদের চিরপ্রবাহিত
চৈতন্যধারার—
ওদের ক্ষুধাপিপাসা-জন্মমৃত্যুর।

গুন্ গুন্ সুরে আধখানা গানের
জোড় মেলাতে খুঁজে বেড়াই
বাকি আধখানা পদ—
এই অকারণ অদ্ভুত খোঁজের কোনো অর্থ নেই
ঐ মাকড়সার বিশ্বচরাচরে,
ঐ পিঁপড়ে-সমাজে।
ওদের নীরব নিখিলে এখনি উঠছে কি
স্পর্শে স্পর্শে সুর, ঘ্রাণে ঘ্রাণে সংগীত,
মুখে মুখে অশ্রুত আলাপ,
চলায় চলায় অব্যক্ত বেদনা ॥

আমি মানুষ—
মনে জানি, সমস্ত জগতে আমার প্রবেশ,
গ্রহনক্ষত্রে ধূমকেতুতে
আমার বাধা যায় খুলে খুলে।
কিন্তু ঐ মাকড়সার জগৎ বদ্ধ রইল চিরকাল
আমার কাছে,
ঐ পিঁপড়ের অন্তরের যবনিকা
পড়ে রইল চিরদিন আমার সামনে,
আমার সুখে দুঃখে ক্ষুব্ধ
সংসারের ধারেই।
ওদের ক্ষুদ্র অসীমের বাইরের পথে
আসি যাই সকালে বিকালে ;
দেখি, শিউলিগাছে কুঁড়ি ধরছে,
টগর গেছে ফুলে ছেয়ে ॥

২৪ ভাদ্র, ১৩৩৯

পু—১২

ক্যামেলিয়া

নাম তার কমলা।
দেখেছি তার খাতার উপরে লেখা।
সে চলেছিল ট্রামে, তার ভাইকে নিয়ে কলেজের রাস্তায়।
আমি ছিলেম পিছনের বেঞ্চিতে।
মুখের একপাশের নিটোল রেখাটি দেখা যায়,
আর ঘাড়ের উপর কোমল চুলগুলি খোঁপার নিচে।
কোলে তার ছিল বই আর খাতা।
যেখানে আমার নামবার সেখানে নামা হল না॥

এখন থেকে সময়ের হিসাব করে বেরোই,—
সে হিসাব আমার কাজের সঙ্গে ঠিকটি মেলে না,
প্রায় ঠিক মেলে ওদের বেরোবার সময়ের সঙ্গে,
প্রায়ই হয় দেখা।
মনে মনে ভাবি, আর কোনো সম্বন্ধ না থাক্,
ও তো আমার সহযাত্রিণী।
নির্মল বুদ্ধির চেহারা
ঝক্‌ঝক্ করছে যেন।
সুকুমার কপাল থেকে চুল উপরে তোলা,
উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি নিঃসংকোচ।
মনে ভাবি, একটা কোনো সংকট দেখা দেয় না কেন,
উদ্ধার করে জন্ম সার্থক করি—
রাস্তার মধ্যে একটা কোনো উৎপাত,
কোনো একজন গুণ্ডার স্পর্ধা।

এমন তো আজকাল ঘটেই থাকে।
কিন্তু আমার ভাগ্যটা যেন ঘোলাজলের ডোবা,
বড়োরকম ইতিহাস ধরে না তার মধ্যে ;
নিরীহ দিনগুলো ব্যাঙের মতো একঘেয়ে ডাকে,
না সেখানে হাঙর-কুমিরের নিমন্ত্রণ, না রাজহাঁসের ॥

একদিন ছিল ঠেলাঠেলি ভিড়,
কমলার পাশে বসেছে একজন আধা-ইংরেজ।
ইচ্ছে করছিল, অকারণে টুপিটা উড়িয়ে দিই তার মাথা থেকে,—
ঘাড়ে ধরে তাকে রাস্তায় দিই নামিয়ে।
কোনো ছুতো পাইনে, হাত নিশ্‌পিশ করে।
এমনসময় সে এক মোটা চুরোট ধরিয়ে
টানতে করলে শুরু।
কাছে এসে বললুম, "ফেলো চুরোট।"
যেন পেলেই না শুনতে,
ধোঁওয়া ওড়াতে লাগল বেশ ঘোরালো করে।
মুখ থেকে টেনে ফেলে দিলেম চুরোট রাস্তায়।
হাতে মুঠো পাকিয়ে একবার তাকাল কটমট ক'রে ;
আর কিছু বললে না, এক লাফে নেমে গেল।
বোধ হয় আমাকে চেনে।
আমার নাম আছে ফুটবল-খেলায়,
বেশ একটু চওড়াগোছের নাম।
লাল হয়ে উঠল মেয়েটির মুখ,
বই খুলে মাথা নিচু করে ভান করলে পড়বার।
হাত কাঁপতে লাগল ;

কটাক্ষেও তাকালে না বীরপুরুষের দিকে।
আপিসের বাবুরা বললে, "বেশ করেছেন, মশায়।"
একটু পরেই মেয়েটি নেমে পড়ল অজায়গায়,
একটা ট্যাক্সি নিয়ে গেল চলে॥

পরদিন তাকে দেখলুম না,
তার পরদিনও না;
তৃতীয় দিনে দেখি,
একটা ঠেলাগাড়িতে চলেছে কলেজে।
বুঝলুম, ভুল করেছি গোঁয়ারের মতো।
ও মেয়ে নিজের দায় নিজেই পারে নিতে,
আমাকে কোনো দরকারই ছিল না।
আবার বললুম মনে মনে,
ভাগ্যটা ঘোলাজলের ডোবা,—
বীরত্বের স্মৃতি মনের মধ্যে কেবলই আজ আওয়াজ করছে
কোলাব্যাঙের ঠাট্টার মতো।
ঠিক করলুম, ভুল শোধরাতে হবে॥

খবর পেয়েছি, গরমের ছুটিতে ওরা যায় দার্জিলিঙে।
সেবার আমারও হাওয়া বদলাবার জরুরি দরকার।
ওদের ছোট্ট বাসা, নাম দিয়েছে মতিয়া—
রাস্তা থেকে একটু নেমে এক কোণে,
গাছের আড়ালে,
সামনে বরফের পাহাড়।
শোনা গেল, আসবে না এবার॥

ফিরব মনে করছি এমন সময়ে আমার এক ভক্তের সঙ্গে দেখা,
মোহনলাল—
রোগা মানুষটি, লম্বা, চোখে চশমা,
দুর্বল পাকযন্ত্র দার্জিলিঙের হাওয়ায় একটু উৎসাহ পায়।
সে বললে, "তনুকা আমার বোন,
কিছুতে ছাড়বে না তোমার সঙ্গে দেখা না ক'রে।"
মেয়েটি ছায়ার মতো,
দেহ যতুটুকু না হলে নয় ততটুকু ;
যতটা পড়াশোনায় ঝোঁক আহারে ততটা নয়।
ফুটবলের সর্দারের 'পরে তাই এত অদ্ভুত ভক্তি ;
মনে করলে, আলাপ করতে এসেছি সে আমার দুর্লভ দয়া।
হায় রে ভাগ্যের খেলা॥

যেদিন নেমে আসব তার দুদিন আগে তনুকা বললে,
"একটি জিনিস দেব আপনাকে যাতে মনে থাকবে আমাদের কথা,—
একটি ফুলের গাছ।"
এ এক উৎপাত। চুপ করে রইলেম।
তনুকা বললে, "দামি দুর্লভ গাছ,
এ দেশের মাটিতে অনেক যত্নে বাঁচে।"
জিগেস করলেম, "নামটা কী ?"
সে বললে, "ক্যামেলিয়া।"
চমক লাগল—
আর-একটা নাম ঝলক দিয়ে উঠল মনের অন্ধকারে।
হেসে বললেম, "ক্যামেলিয়া,
সহজে বুঝি এর মন মেলে না।"

তনুকা কী বুঝলে জানিনে, হঠাৎ লজ্জা পেলে,
খুশিও হল ॥

চললেম টবসুদ্ধ গাছ নিয়ে।
দেখা গেল, পার্শ্ববর্তিনী হিসাবে সহযাত্রিণীটি সহজ নয়।
একটা দো-কামরা গাড়িতে
টবটাকে লুকোলেম নাবার ঘরে।
থাক্ এই ভ্রমণবৃত্তান্ত,
বাদ দেওয়া যাক আরো মাস-কয়েকের তুচ্ছতা ॥

পুজোর ছুটিতে প্রহসনের যবনিকা উঠল
সাঁওতালপরগনায়।
জায়গাটা ছোটো। নাম বলতে চাইনে,—
বায়ুবদলের বায়ুগ্রস্তদল এ জায়গার খবর জানে না।
কমলার মামা ছিলেন রেলের এঞ্জিনিয়র।
এইখানে বাসা বেঁধেছেন
শালবনের ছায়ায়, কাঠবিড়ালিদের পাড়ায়।
সেখানে নীল পাহাড় দেখা যায় দিগন্তে,
অদূরে জলধারা চলেছে বালির মধ্যে দিয়ে,—
পলাশবনে তসরের গুটি ধরেছে,
মহিষ চরছে হর্তকি গাছের তলায়,—
উলঙ্গ সাঁওতালের ছেলে পিঠের উপরে।
বাসাবাড়ি কোথাও নেই,—
তাই তাঁবু পাতলেম নদীর ধারে।
সঙ্গী ছিল না কেউ,
কেবল ছিল টবে সেই ক্যামেলিয়া ॥

কমলা এসেছে মাকে নিয়ে।
রোদ ওঠবার আগে
হিমে-ছোঁওয়া স্নিগ্ধ হাওয়ায়
শালবাগানের ভিতর দিয়ে বেড়াতে যায় ছাতি হাতে।
মেঠো ফুলগুলো পায়ে এসে মাথা কোটে,—
কিন্তু সে কি চেয়ে দেখে।
অল্পজল নদী পায়ে হেঁটে
পেরিয়ে যায় ওপারে,
সেখানে শিশুগাছের তলায় বই পড়ে।
আর, আমাকে সে যে চিনেছে
তা জানলেম, আমাকে লক্ষ্য করে না ব'লেই ॥

একদিন দেখি, নদীর ধারে বালির উপর চড়িভাতি করছে এরা।
ইচ্ছে হল গিয়ে বলি, "আমাকে দরকার কি নেই কিছুতেই।
আমি পারি জল তুলে আনতে নদী থেকে—
পারি বন থেকে কাঠ আনতে কেটে,
আর তা ছাড়া কাছাকাছি জঙ্গলের মধ্যে
একটা ভদ্রগোছের ভালুকও কি মেলে না।"

দেখলেম দলের মধ্যে একজন যুবক—
শর্ট-পরা, গায়ে রেশমের বিলিতি জামা,
কমলার পাশে পা ছড়িয়ে
হাভানা চুরোট খাচ্ছে।
আর, কমলা অন্যমনে টুকরো টুকরো করছে
একটা শ্বেতজবার পাপড়ি।

পাশে পড়ে আছে
বিলিতি মাসিক পত্র ॥
মুহূর্তে বুঝলেম, এই সাঁওতালপরগনার নির্জন কোণে
আমি অসহ্য অতিরিক্ত, ধরবে না কোথাও।
তখনি চলে যেতেম, কিন্তু বাকি আছে একটি কাজ।
আর দিনকয়েকেই ক্যামেলিয়া ফুটবে,
পাঠিয়ে দিয়ে তবে ছুটি।
সমস্তদিন বন্দুক ঘাড়ে শিকারে ফিরি বনে জঙ্গলে,
সন্ধ্যার আগে ফিরে এসে টবে দিই জল
আর দেখি কুঁড়ি এগোল কত দূর ॥

সময় হয়েছে আজ।
যে আনে আমার রান্নার কাঠ
ডেকেছি সেই সাঁওতাল মেয়েটিকে।
তার হাত দিয়ে পাঠাব
শালপাতার পাত্রে।
তাঁবুর মধ্যে বসে তখন পড়ছি ডিটেক্‌টিভ গল্প।
বাইরে থেকে মিষ্টিসুরে আওয়াজ এল, "বাবু, ডেকেছিস কেনে।"
বেরিয়ে এসে দেখি ক্যামেলিয়া
সাঁওতাল মেয়ের কানে,
কালো গালের উপর আলো করেছে।
সে আবার জিগেস করলে, "ডেকেছিস কেনে?"
আমি বললেম, "এই জন্যেই।"
তার পরে ফিরে এলেম কলকাতায় ॥

২৭ শ্রাবণ, ১৩৩৯

শালিখ

শালিখটার কী হল তাই ভাবি।
একলা কেন থাকে দলছাড়া।
প্রথম দিন দেখেছিলেম শিমুলগাছের তলায়,
আমার বাগানে,
মনে হল একটু যেন খুঁড়িয়ে চলে।
তারপরে ঐ রোজ সকালে দেখি,—
সঙ্গীহারা, বেড়ায় পোকা শিকার ক'রে।
উঠে আসে আমার বারান্দায়,
নেচে নেচে করে সে পায়চারি ;
আমার 'পরে একটুকু নেই ভয়।
কেন এমন দশা।
সমাজের কোন্ শাসনে নির্বাসনের পালা,
দলের কোন্ অবিচারে
জাগল অভিমান।
কিছুদূরেই শালিখগুলো
করছে বকাবকি,
ঘাসে ঘাসে তাদের লাফালাফি,
উড়ে বেড়ায় শিরীষগাছের ডালে ডালে ;
ওর দেখি তো খেয়াল কিছুই নেই।
জীবনে ওর কোন্‌খানে যে গাঁঠ পড়েছে,
সেই কথাটাই ভাবি।
সকালবেলার রোদে যেন সহজ মনে
আহার খুঁটে খুঁটে

ঝড়ে-পড়া পাতার উপর
লাফিয়ে বেড়ায় সারাবেলা।
কারো উপর নালিশ কিছু আছে,
মনে হয় না একটুও তা।
বৈরাগ্যের গর্ব তো নেই ওর চলনে,
কিম্বা দুটো আগুন-জ্বলা চোখ॥

কিন্তু ওকে দেখিনি তো সন্ধেবেলায়—
একলা যখন যায় বাসাতে ডালের কোণে,
ঝিল্লি যখন ঝিঁ ঝিঁ করে অন্ধকারে,
হাওয়ায় আসে বাঁশের পাতার ঝর্‌ঝরানি।
গাছের ফাঁকে তাকিয়ে থাকে
ঘুমভাঙানো
সঙ্গীবিহীন সন্ধ্যাতারা॥

২১ ভাদ্র, ১৩৩৯

সাধারণ মেয়ে

আমি অন্তঃপুরের মেয়ে,—
চিনবে না আমাকে।
তোমার শেষ গল্পের বইটি পড়েছি, শরৎবাবু,
'বাসি ফুলের মালা'।
তোমার নায়িকা এলোকেশীর মরণদশা ধরেছিল
পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে।
পঁচিশ বছর বয়সের সঙ্গে ছিল তার রেষারেষি,
দেখলেম, তুমি মহদাশয় বটে,
জিতিয়ে দিলে তাকে॥

নিজের কথা বলি।
বয়স আমার অল্প।
একজনের মন ছুঁয়েছিল
আমার এই কাঁচা বয়সের মায়া।
তাই জেনে পুলক লাগত আমার দেহে ;
ভুলে গিয়েছিলেম, অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে আমি।
আমার মতো এমন আছে হাজার হাজার মেয়ে,
অল্পবয়সের মন্ত্র তাদের যৌবনে॥

তোমাকে দোহাই দিই,
একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লেখো তুমি।
বড়ো দুঃখ তার।
তারো স্বভাবের গভীরে
অসাধারণ যদি কিছু তলিয়ে থাকে কোথাও

কেমন করে প্রমাণ করবে সে,
এমন কজন মেলে যারা তা ধরতে পারে।
কাঁচাবয়সের জাদু লাগে ওদের চোখে,
মন যায় না সত্যের খোঁজে,
আমরা বিকিয়ে যাই মরীচিকার দামে॥

কথাটা কেন উঠল তা বলি।
মনে করো, তার নাম নরেশ।
সে বলেছিল, কেউ তার চোখে পড়েনি আমার মতো।
এতবড়ো কথাটা বিশ্বাস করব যে সাহস হয় না,
না করব যে এমন জোর কই॥

একদিন সে গেল বিলেতে।
চিঠিপত্র পাই কখনো বা।
মনে মনে ভাবি, রাম রাম, এত মেয়েও আছে সে দেশে,
এত তাদের ঠেলাঠেলি ভিড়।
আর, তারা কি সবাই অসামান্য,
এত বুদ্ধি, এত উজ্জ্বলতা।
আর, তারা সবাই কি আবিষ্কার করেছে এক নরেশ সেনকে
স্বদেশে যার পরিচয় চাপা ছিল দশের মধ্যে॥

গেল মেল-এর চিঠিতে লিখেছে
লিজির সঙ্গে গিয়েছিল সমুদ্রে নাইতে।
বাঙালি কবির কবিতা ক'লাইন দিয়েছে তুলে,
সেই যেখানে উর্বশী উঠছে সমুদ্র থেকে।

তার পরে বালির 'পরে বসল পাশাপাশি ;
সামনে ছুলছে নীল সমুদ্রের ঢেউ,
আকাশে ছড়ানো নির্মল সূর্যালোক।
লিজি তাকে খুব আস্তে আস্তে বললে,
"এই সেদিন তুমি এসেছ, ছুদিন পরে যাবে চলে,
ঝিনুকের ছুটি খোলা,
মাঝখানটুকু ভরা থাক্
একটি নিরেট অশ্রুবিন্দু দিয়ে—
ছুর্লভ, মূল্যহীন।"
কথা বলবার কী অসামান্য ভঙ্গী।
সেই সঙ্গে নরেশ লিখেছে,
"কথাগুলি যদি বানানো হয় দোষ কী,
কিন্তু চমৎকার—
হীরে-বসানো সোনার ফুল কি সত্য, তবুও কি সত্য নয়।"
বুঝতেই পারছ,
একটা তুলনার সংকেত ওর চিঠিতে অদৃশ্য কাঁটার মতো
আমার বুকের কাছে বিঁধিয়ে দিয়ে জানায়—
আমি অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে।
মূল্যবানকে পুরো মূল্য চুকিয়ে দিই
এমন ধন নেই আমার হাতে।
ওগো না-হয় তাই হল,
না হয় ঋণীই রইলেম চিরজীবন॥

পায়ে পড়ি তোমার, একটা গল্প লেখো তুমি, শরৎবাবু,
নিতান্ত সাধারণ মেয়ের গল্প,—

যে দুর্ভাগিনীকে দূরের থেকে পাল্লা দিতে হয়
অন্তত পাঁচ-সাতজন অসামান্যার সঙ্গে—
অর্থাৎ, সপ্তরথিনীর মার।
বুঝে নিয়েছি, আমার কপাল ভেঙেছে,
হার হয়েছে আমার।
কিন্তু তুমি যার কথা লিখবে,
তাকে জিতিয়ে দিয়ো আমার হয়ে,
পড়তে পড়তে বুক যেন ওঠে ফুলে।
ফুলচন্দন পড়ুক তোমার কলমের মুখে॥

তাকে নাম দিয়ো মালতী।
ঐ নামটা আমার।
ধরা পড়বার ভয় নেই;
এমন অনেক মালতী আছে বাংলাদেশে,
তারা সবাই সমান্য মেয়ে,
তারা ফরাসি জর্মান জানে না,
কাঁদতে জানে॥

কী করে জিতিয়ে দেবে।
উচ্চ তোমার মন, তোমার লেখনী মহীয়সী।
তুমি হয়তো ওকে নিয়ে যাবে ত্যাগের পথে,
দুঃখের চরমে, শকুন্তলার মতো।
দয়া কোরো আমাকে।
নেমে এসো আমার সমতলে।
বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাত্রির অন্ধকারে

দেবতার কাছে যে অসম্ভব বর মাগি—
সে বর আমি পাব না,
কিন্তু পায় যেন তোমার নায়িকা।
রাখো-না কেন নরেশকে সাত বছর লণ্ডনে,
বারে বারে ফেল করুক তার পরীক্ষায়,
আদরে থাক্ আপন উপাসিকামণ্ডলীতে।
ইতিমধ্যে মালতী পাস করুক এম. এ.
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে,
গণিতে হোক প্রথম তোমার কলমের এক আঁচড়ে।
কিন্তু ঐখানেই যদি থাম
তোমার সাহিত্যসম্রাট নামে পড়বে কলঙ্ক।
আমার দশা যাই হোক,
খাটো কোরো না তোমার কল্পনা।
তুমি তো কৃপণ নও বিধাতার মতো।
মেয়েটাকে দাও পাঠিয়ে য়ুরোপে।
সেখানে যারা জ্ঞানী, যারা বিদ্বান, যারা বীর,
যারা কবি, যারা শিল্পী, যারা রাজা,
দল বেঁধে আসুক ওর চারিদিকে।
জ্যোতির্বিদের মতো আবিষ্কার করুক ওকে
শুধু বিদুষী ব'লে নয়, নারী ব'লে।
ওর মধ্যে যে বিশ্ববিজয়ী জাদু আছে
ধরা পড়ুক তার রহস্য, মূঢ়ের দেশে নয়,
যে দেশে আছে সমজদার, আছে দরদি,
আছে ইংরেজ জর্মান ফরাসী।
মালতীর সম্মানের জন্য সভা ডাকা হোক-না—

বড়ো বড়ো নামজাদার সভা।
মনে করা যাক, সেখানে বর্ষণ হচ্ছে মুষলধারে চাটুবাক্য ;
মাঝখান দিয়ে সে চলেছে অবহেলায়
ঢেউয়ের উপর দিয়ে যেন পালের নৌকো।
ওর চোখ দেখে ওরা করছে কানাকানি ;
সবাই বলছে, ভারতবর্ষের সজল মেঘ আর উজ্জ্বল রৌদ্র
মিলেছে ওর মোহিনী দৃষ্টিতে।
(এইখানে জনান্তিকে বলে রাখি,
স্বষ্টিকর্তার প্রসাদ সত্যই আছে আমার চোখে।
বলতে হল নিজের মুখেই,
এখনো কোনো য়ুরোপীয় রসজ্ঞের
সাক্ষাৎ ঘটেনি কপালে।)
নরেশ এসে দাঁড়াক সেই কোণে,
আর তার সেই অসামান্য মেয়ের দল॥

আর তার পরে ?
তার পরে আমার নটেশাকটি মুড়োল,
স্বপ্ন আমার ফুরোল
হায় রে সামান্য মেয়ে।
হায় রে বিধাতার শক্তির অপব্যয়॥

২৯ শ্রাবণ, ১৩৩৯

একজন লোক

আধবুড়ো হিন্দুস্থানি—
রোগা লম্বা মানুষ,
পাকা গোঁফ, দাড়ি-কামানো মুখ,
শুকিয়ে-আসা ফলের মতো।
ছিটের মেরজাই গায়ে, মালকোঁচা ধুতি,
বাঁ কাঁধে ছাতি, ডান হাতে খাটো লাঠি,
পায়ে নাগরা, চলেছে শহরের দিকে।
ভাদ্রমাসের সকাল বেলা,
পাতলা মেঘের ঝাপসা রোদ্দুর ;
কাল গিয়েছে কম্বল-চাপা হাঁপিয়ে-ওঠা রাত,
আজ সকালে কুয়াশা-ভিজে হাওয়া
দো-মনা করে বইছে আমলকীর কচি ডালে॥

পথিকটিকে দেখা গেল
আমার বিশ্বের শেষরেখাতে
যেখানে বস্তুহারা ছায়াছবির চলাচল।
ওকে শুধু জানলুম, একজন লোক।
ওর নাম নেই, সংজ্ঞা নেই, বেদনা নেই,
কিছুতে নেই কোনো দরকার,
কেবল হাটে-চলার পথে
ভাদ্রমাসের সকালবেলায়
একজন লোক॥

সেও আমায় গেছে দেখে
তার জগতের পোড়ো জমির শেষ সীমানায়
যেখানকার নীল কুয়াশার মাঝে
কারো সঙ্গে সম্বন্ধ নেই কারো,
যেখানে আমি—একজন লোক ॥

তার ঘরে তার বাছুর আছে,
ময়না আছে খাঁচায় ;
স্ত্রী আছে তার, জাঁতায় আটা ভাঙে,
পিতলের মোটা কাঁকন হাতে ;
আছে তার ধোবা প্রতিবেশী,
আছে মুদি দোকানদার,
দেনা আছে কাবুলিদের কাছে ;
কোনোখানেই নেই
আমি—একজন লোক ।

১৭ ভাদ্র, ১৩৩৯

খেলনার মুক্তি

এক আছে মণিদিদি,
আর আছে তার ঘরে জাপানি পুতুল—
নাম হানাসান।
পরেছে জাপানি পেশোয়াজ,
ফিকে সবুজের 'পরে ফুলকাটা সোনালিরঙের।
বিলেতের হাট থেকে এল তার বর—
সেকালের রাজপুত্র, কোমরেতে তলোয়ার বাঁধা,
মাথার টুপিতে উঁচু পাখির পালক ;
কাল হবে অধিবাস, পর্‌শু হবে বিয়ে ॥

সন্ধে হল।
পালঙ্কেতে শুয়ে হানাসান।
জ্বলে ইলেক্‌ট্রিক বাতি।
কোথা থেকে এল এক কালো চামচিকে—
উড়ে উড়ে ফেরে ঘুরে ঘুরে,
সঙ্গে তার ঘোরে ছায়া।
হানাসান ডেকে বলে,
"চামচিকে, লক্ষ্মী ভাই, আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাও
মেঘেদের দেশে।
জন্মেছি খেলনা হয়ে—
যেখানে খেলার স্বর্গ
সেইখানে হয় যেন গতি
ছুটির খেলায়।"

মণিদিদি এসে দেখে পালঙ্কে তো নেই হানাসান।
কোথা গেল, কোথা গেল।
বটগাছে আঙিনার পারে
বাসা করে আছে ব্যাঙ্গমা ;
সে বলে, "আমি তো জানি,
চামচিকে ভায়া
তাকে নিয়ে উড়ে চলে গেছে।"
মণি বলে, "হেই দাদা, হেই ব্যাঙ্গমা ;
আমাকেও নিয়ে চলো,
ফিরিয়ে আনি গে।"

ব্যাঙ্গমা মেলে দিল পাখা ;
মণিদিদি উড়ে চলে সারারাত্রি ধরে।
ভোর হল ; এল চিত্রকূটগিরি,
সেইখানে মেঘেদের পাড়া।
মণি ডাকে, "হানাসান, কোথা হানাসান—
খেলা যে আমার প'ড়ে আছে।"

নীল মেঘ বলে এসে,
"মানুষ কি খেলা জানে।
খেলা দিয়ে শুধু বাঁধে যাকে নিয়ে খেলে।"
মণি বলে, "তোমাদের খেলা কী রকম।"
কালো মেঘ ভেসে এল,
হেসে চিকিমিকি
ডেকে গুরুগুরু

বলে, "ঐ চেয়ে দেখো, হানাহানি হল নানাখানা ;
ওর ছুটি নানা রঙে
নানা চেহারায়,
নানা দিকে
বাতাসে বাতাসে
আলোতে আলোতে।"

মণি বলে, "ব্যাঙ্গমা দাদা,
এদিকে বিয়ে যে ঠিক—
বর এসে কী বলবে শেষে।"
ব্যাঙ্গমা হেসে বলে,
"আছে চামচিকে ভায়া,
বরকেও নিয়ে দেবে পাড়ি।
বিয়ের খেলাটা সেও
মিলে যাবে সূর্যাস্তের শূন্যে এসে
গোধূলির মেঘে।"
মণি কেঁদে বলে, "তবে,
শুধু কি রইবে বাকি কান্নার খেলা।"
ব্যাঙ্গমা বলে, "মণিদিদি,
রাত হয়ে যাবে শেষ,—
কাল সকালের ফোটা বৃষ্টিধোওয়া মালতীর ফুলে
সে-খেলাও চিনবে না কেউ।"

১৩ আষাঢ়, ১৩৩৯

পত্রলেখা

দিলে তুমি সোনা-মোড়া ফাউন্টেন পেন,—
কত মতো লেখার আসবাব।
ছোটো ডেস্‌কোখানি
আখরোটকাঠ দিয়ে গড়া।
ছাপ-মারা চিঠির কাগজ
নানা বহরের।
রুপোর কাগজ-কাটা, এনামেল করা।
কাঁচি, ছুরি, গালা, লাল ফিতে।
কাঁচের কাগজ-চাপা,
লাল নীল সবুজ পেনসিল।
বলে গিয়েছিলে তুমি, চিঠি লেখা চাই
একদিন পরে পরে॥

লিখতে বসেছি চিঠি,
সকালেই স্নান হয়ে গেছে।
লিখি যে কী কথা নিয়ে কিছুতেই ভেবে পাইনে তো।
একটি খবর আছে শুধু,—
তুমি চলে গেছ।
সে-খবর তোমারও তো জানা।
তবু মনে হয়,
ভালো করে তুমি সে জান না।
তাই ভাবি, এ কথাটি জানাই তোমাকে,—
তুমি চলে গেছ।

যতবার লেখা শুরু করি
ততবার ধরা পড়ে, এ খবর সহজ তো নয়।
আমি নই কবি—
ভাষার ভিতরে আমি কণ্ঠস্বর পারিনে তো দিতে,
না থাকে চোখের চাওয়া।
যত লিখি তত ছিঁড়ে ফেলি॥

দশটা তো বেজে গেল।
তোমার ভাইপো বকু যাবে ইস্‌কুলে,
যাই তাকে খাইয়ে আসিগে।
শেষবার এই লিখে যাই,—
তুমি চলে গেছ।
বাকি আর যতকিছু
হিজিবিজি আঁকাজোকা ব্লটিঙের ’পরে॥

১৪ আষাঢ়, ১৩৩৯

খ্যাতি

ভাই নিশি,
তখন উনিশ আমি, তুমি হবে বুঝি
পঁচিশের কাছকাছি।
তোমার দুখানা বই ছাপা হয়ে গেছে,
'ক্ষান্তপিসি', তার পরে 'পঞ্চুর মৌতাত'।
তা ছাড়া মাসিকপত্র কালচক্রে ক্রমে বের হল
'রক্তের আঁচড়'।
হুলুস্থুল পড়ে গেল দেশে।
কলেজের সাহিত্যসভায়
সেদিন বলেছিলেম, বঙ্কিমের চেয়ে তুমি বড়ো,—
তাই নিয়ে মাথা-ফাটাফাটি।
আমাকে খ্যাপাত দাদা নিশি-পাওয়া বলে।
কলেজের পালা শেষে
করেছি ডেপুটিগিরি,
ইস্তফা দিয়েছি কাজে স্বদেশীর দিনে।
তার পর থেকে যা আমার
সৌভাগ্য অভাবনীয় তাই ঘটে গেল—
বন্ধুরূপে পেলেম তোমাকে।
কাছে পেয়ে কোনোদিন
তোমাকে করিনি খাটো—
ছোটো বড়ো নানা ত্রুটি সেও আমি হেসে ভালোবেসে
তোমার মহত্ত্বে সবই মিলিয়ে নিয়েছি
এ ধৈর্য, এ পূর্ণদৃষ্টি, সেও যে তোমারি কাছে শেখা।

দোষে-ভরা অসামান্য প্রাণ—
সে-চরিত্র রচনায় সব-চেয়ে ওস্তাদি তোমার,
সে তো আমি জানি ॥

তার পরে কতবার অনুরোধ করেছ কেবলই,
বলেছিলে, "লেখো, লেখো, গল্প লেখো।
লেখকের মঞ্চে ছিল পিঠ-উঁচু তোমারি চৌকিটা।
আত্ম অবিশ্বাসে শুধু আটকে পড়েছ
পড়ুয়ার নিচের বেঞ্চিতে।"
শেষকালে বহু ইতস্তত ক'রে
লেখা করলেম শুরু ॥

বিষয়টা ঘটেছিল আমারই আমলে
পান্তিঘাটায়।
আসামি পোলিটিকাল,
সাতমাস পলাতক।
মাকে দেখে যাবে ব'লে একদিন রাত্রে এসেছিল
প্রাণ হাতে ক'রে।
খুড়ো গেল পুলিসে খবর দিতে।
কিছুদিন নিল সে আশ্রয়
জেলেনির ঘরে।
যখন পড়ল ধরা সত্য সাক্ষ্য দিল খুড়ো,
মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়েছে জেলেনি।
জেলেনিকে দিতে হল জেলে,
খুড়ো হল সাব্‌রেজিস্ট্রার ॥

গল্পখানা পড়ে
  বিস্তর বাহবা দিয়েছিলে।
      খাতাখানা নিজে নিয়ে
        শম্ভু সাণ্ডেলের ঘরে
  বলে এলে, কালচক্রে অবিলম্বে বের হওয়া চাই।
        বের হল মাসে মাসে।
      শুকনো কাশে আগুনের মতো
  ছড়িয়ে পড়ল খ্যাতি নিমেষে নিমেষে।
        বাঁশরিতে লিখে দিলে,
  কোথা লাগে অশুবাবু এ নবীন লেখকের কাছে।
        শুনে হেসেছিলে তুমি।
পাঞ্চজন্যে লিখেছিল রতিকান্ত ঘোষ,
        এতদিনে বাঙলা ভাষায়
          সত্য লেখা পাওয়া গেল
            ইত্যাদি ইত্যাদি।
এবার হাসনি তুমি।
    তার পর থেকে
      তোমার আমার মাঝখানে
        খ্যাতির কাঁটার বেড়া ক্রমে ঘন হল

এখন আমার কথা শোনো।
    আমার এ খ্যাতি
আধুনিক মত্ততার ইঞ্চিতুই পলিমাটি-'পরে
        হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা।
          স্টুপিড জানে না,—

মূল এর বেশি দূর নয়,
ফল এর কোনোখানে নেই,
কেবলই পাতার ঘটা।
তোমার যে পঞ্চু সে তো বাঙলার ডন্ কুইক্সোট্,
তার যা মৌতাত
সে যে জন্মখ্যাপাদের মগজে মগজে
দেশে দেশে দেখা দেয় চিরকাল।
এ আমার কুঞ্জলাল তুবড়ির মতো
জ্বলে আর নেবে—
বোকাদের চোখে লাগে ধাঁধা।
আমি জানি তুমি কতখানি বড়ো।
এ ফাঁকা খ্যাতির চোরা মেকি পয়সায়
বিকাব কি বন্ধুত্ব তোমার।
কাগজের মোড়কটা খুলে দেখো
আমার লেখার দগ্ধশেষ।
আজ বাদে কাল হত ধুলো,
আজ হোক ছাই॥

২৪ আষাঢ়, ১৩৩৯

বাঁশি

কিনু গোয়ালার গলি।
দোতলা বাড়ির
লোহার গরাদে-দেওয়া একতলা ঘর
পথের ধারেই।
লোনা-ধরা দেয়ালেতে মাঝে মাঝে ধসে গেছে বালি,
মাঝে মাঝে স্যাঁতা-পড়া দাগ।
মার্কিন থানের মার্কা একখানা ছবি
সিদ্ধিদাতা গণেশের
দরজার 'পরে আঁটা।
আমি ছাড়া ঘরে থাকে আরেকটা জীব
এক ভাড়াতেই,
সেটা টিকটিকি।
তফাত আমার সঙ্গে এই শুধু,
নেই তার অন্নের অভাব॥

বেতন পঁচিশ টাকা,
সদাগরি আপিসের কনিষ্ঠ কেরানি।
খেতে পাই দত্তদের বাড়ি
ছেলেকে পড়িয়ে।
শেয়ালদা ইস্টিশনে যাই,
সন্ধেটা কাটিয়ে আসি;
আলো জ্বালাবার দায় বাঁচে।
এঞ্জিনের ধস্ ধস্,
বাঁশির আওয়াজ

যাত্রীর ব্যস্ততা,

কুলি-হাঁকাহাঁকি ।

সাড়ে দশ বেজে যায়,

তার পরে ঘরে এসে নিরালা নিঃঝুম অন্ধকার ॥

ধলেশ্বরী নদীতীরে পিসিদের গ্রাম ।

তাঁর দেওরের মেয়ে,

অভাগার সাথে তার বিবাহের ছিল ঠিকঠাক ।

লগ্ন শুভ, নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল—

সেই লগ্নে এসেছি পালিয়ে ।

মেয়েটা তো রক্ষে পেলে,

আমি তথৈবচ ।

ঘরেতে এল না সে তো, মনে তার নিত্য আসাযাওয়া—

পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর ॥

বর্ষা ঘনঘোর ।

ট্রামের খরচা বাড়ে,

মাঝে মাঝে মাইনেও কাটা যায় ।

গলিটার কোণে কোণে

জমে ওঠে, পচে ওঠে—

আমের খোসা ও আঁঠি, কাঁঠালের ভুতি,

মাছের কানকা,

মরা বেড়ালের ছানা,

ছাইপাঁশ আরো কত কী যে ।

ছাতার অবস্থাখানা জরিমানা-দেওয়া

মাইনের মতো,
বহু ছিদ্র তার।
আপিসের সাজ
গোপীকান্ত গোঁসাইয়ের মনটা যেমন,
সর্বদাই রসসিক্ত থাকে।
বাদলের কালো ছায়া
স্যাতসেঁতে ঘরটাতে ঢুকে
কলে-পড়া জন্তুর মতন
মূর্ছায় অসাড়।
দিনরাত মনে হয়, কোন্ আধমরা
জগতের সঙ্গে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছি॥

গলির মোড়েই থাকে কান্তবাবু—
যত্নে পাট করা লম্বা চুল,
বড়ো বড়ো চোখ,
শৌখিন মেজাজ।
কর্নেট বাজানো তার শখ॥

মাঝে মাঝে সুর জেগে ওঠে
এ গলির বীভৎস বাতাসে—
কখনো গভীর রাতে,
ভোরবেলা আধো অন্ধকারে,
কখনো বৈকালে
ঝিকিমিকি আলোয় ছায়ায়।
হঠাৎ সন্ধ্যায়

সিন্ধু বারোয়াঁয় লাগে তান,
    সমস্ত আকাশে বাজে
অনাদি কালের বিরহবেদনা ॥

    তখনি মুহূর্তে ধরা পড়ে
        এ গলিটা ঘোর মিছে
    দুর্বিষহ মাতালের প্রলাপের মতো।
        হঠাৎ খবর পাই মনে,
    আকবর বাদশার সঙ্গে
        হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই।
    বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে
ছেঁড়া-ছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে
            এক বৈকুণ্ঠের দিকে ॥

এ গান যেখানে সত্য
অনন্ত গোধূলিলগ্নে
    সেইখানে
        বহি চলে ধলেশ্বরী,
তীরে তমালের ঘন ছায়া,—
        আঙিনাতে
যে আছে অপেক্ষা করে তার
    পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।

২৫ আষাঢ়, ১৩৩৯

উন্নতি

উপরে যাবার সিঁড়ি,
তারি নীচে দক্ষিণের বারান্দায়
নীলমণি মাস্টারের কাছে
সকালে পড়তে হত ইংলিশ রীডার।
ভাঙা পাঁচিলের কাছে ছিল মস্ত তেঁতুলের গাছ।
ফল পাকবার বেলা
ডালে ডালে ঝপাঝপ বাঁদরের হত লাফালাফি।
ইংরেজি বানান ছেড়ে ছুই চক্ষু ছুটে যেত
ল্যেজ-দোলা বাঁদরের দিকে।
সেই উপলক্ষ্যে
আমার বুদ্ধির সঙ্গে রাঙামুখো বাঁদরের
নির্ভেদ নির্ণয় করে
মাস্টার দিতেন কানমলা ॥

ছুটি হলে পরে
শুরু হত আমার মাস্টারি
উদ্ভিদমহলে।
ফলসা চালতা ছিল, ছিল সারবাঁধা
স্থপুরির গাছ।
অনাহূত জন্মেছিল কী করে কুলের এক চারা
বাড়ির গা ঘেঁষে ;
সেটাই আমার ছাত্র ছিল।
ছড়ি দিয়ে মারতেম তাকে।

বলতেম, "দেখ্ দেখি বোকা,
উঁচু ফলসার গাছে ফল ধরে গেল—
কোথাকার বেঁটে কুল উন্নতির উৎসাহই নেই।"
শুনেছি বাবার মুখে যত উপদেশ
তার মধ্যে বারবার 'উন্নতি' কথাটা শোনা যেত।
ভাঙা বোতলের ঝুড়ি বেচে
শেষকালে কে হয়েছে লক্ষপতি ধনী
সেই গল্প শুনে শুনে
উন্নতি যে কাকে বলে দেখেছি সুস্পষ্ট তার ছবি।
বড়ো হওয়া চাই,
অর্থাৎ নিতান্ত পক্ষে হতে হবে বাজিদ্‌পুরের
ভজু মল্লিকের জুড়ি।
ফলসার ফলে ভরা গাছ
বাগানমহলে সেই ভজু মহাজন।
চারাটাকে রোজ বোঝাতেম,
ওরি মতো বড়ো হতে হবে।
কাঠি দিয়ে মাপি তাকে এবেলা ওবেলা;
আমারি কেবল রাগ বাড়ে,
আর কিছু বাড়ে না তো।
সেই কাঠি দিয়ে তাকে মারি শেষে সপাসপ জোরে,—
একটু ফলেনি তাতে ফল।
কানমলা যত দিই
পাতাগুলো ম'লে ম'লে
ততই উন্নতি তার কমে॥

ইদিকে ছিলেন বাবা ইন্‌কম্‌ ট্যাক্সো-কালেক্টার,
বদলি হলেন
বর্ধমান ডিভিজনে।
উচ্চ ইংরেজি স্কুলে পড়া শুরু করে
উচ্চতার পূর্ণ পরিণতি
কলকাতা গিয়ে॥

বাবার মৃত্যুর পরে সেক্রেটারিয়েটে
উন্নতির ভিত্তি ফাঁদা গেল।
বহুকষ্টে বহু ঋণ করে
বোনের দিয়েছি বিয়ে।
নিজের বিবাহ প্রায় টার্মিনসে এল
আগামী ফাল্গুন মাসে নবমী তিথিতে
নববসন্তের হাওয়া ভিতরে বাইরে
বইতে আরম্ভ হল যেই—
এমন সময়ে, রিডাক্‌শান॥

পোকাখাওয়া কাঁচা ফল
বাইরেতে দিব্যি টুপ্‌টুপে,
ঝুপ করে খসে পড়ে
বাতাসের এক দমকায়—
আমার সে দশা।
বসন্তের আয়োজনে যে একটু ত্রুটি হল
সে কেবল আমারি কপালে।
আপিসের লক্ষ্মী ফিরালেন মুখ,

ঘরের লক্ষ্মীও
স্বর্ণকমলের খোঁজে অন্যত্র হলেন নিরুদ্দেশ।
সার্টিফিকেটের তাড়া হাতে,
শুকনো মুখ,
চোখ গেছে বসে,
তুবড়ে গিয়েছে পেট,
জুতোটার তলা ছেঁড়া,
দেহের বর্ণের সঙ্গে চাদরের
ঘুচে গেছে বর্ণভেদ,
ঘুরে মরি বড়োলোকদের দ্বারে।
এমনসময় চিঠি এল,
ভজু মহাজন
দেনায় দিয়েছে ক্রোক ভিটেবাড়িখানা॥

বাড়ি গিয়ে উপরের ঘরে
জানলা খুলতে সেটা ডালে ঠেকে গেল।
রাগ হল মনে—
ঠেলাঠেলি করে দেখি,
আরে আরে ছাত্র যে আমার।
শেষকালে বড়োই তো হল,
উন্নতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিলে
ভজু মল্লিকেরই মতো আমার দুয়ারে দিয়ে হানা॥

২৬ আষাঢ়, ১৩৩৯

ভীরু

ম্যাট্রিকুলেশনে পড়ে
ব্যঙ্গসুচতুর
বটেকৃষ্ট, ভীরু ছেলেদের বিভীষিকা।
একদিন কী কারণে
সুনীতকে দিয়েছিল উপাধি 'পরমহংস' ব'লে।
ক্রমে সেটা হল 'পাতিহাঁস'।
শেষকালে হল 'হাঁসখালি'।
কোনো তার অর্থ নেই, সেই তার খোঁচা॥

আঘাতকে ডেকে আনে
যে নিরীহ আঘাতকে করে ভয়।
নিষ্ঠুরের দল বাড়ে,
ছোঁয়াচ লাগায় অট্টহাসে।
ব্যঙ্গরসিকের যত অংশ-অবতার
নিষ্কাম বিদ্রূপসূচি বিঁধে
অহৈতুক বিদ্বেষেতে সুনীতকে করে জরজর॥

একদিন মুক্তি পেল সে বেচারা,
বেরোল ইস্কুল থেকে।
তার পরে গেল বহুদিন,—
তবু যেন নাড়িতে জড়িয়ে ছিল
সেদিনের সশঙ্ক সংকোচ।
জীবনে অন্যায় যত, হাস্যবক্র যত নির্দয়তা

তারি কেন্দ্রস্থলে
বটেকৃষ্ট রেখে গেছে কালো স্থূল বিগ্রহ আপন ॥

সে কথা জানত বটু ;
সুনীতের এই অন্ধ ভয়টাকে
মাঝে মাঝে নাড়া দিয়ে পেত সুখ
হিংস্র ক্ষমতার অহংকারে ;
ডেকে যেত সেই পুরাতন নামে,
হেসে যেত খলখল হাসি ॥

বি. এল. পরীক্ষা দিয়ে
সুনীত ধরেছে ওকালতি,
ওকালতি ধরল না তাকে।
কাজের অভাব ছিল, সময়ের অভাব ছিল না—
গান গেয়ে, সেতার বাজিয়ে
ছুটি ভরে যেত।
নিয়ামৎ ওস্তাদের কাছে
হত তার সুরের সাধনা ॥

ছোটো বোন সুধা,
ডায়োসিসনের বি. এ,
গণিতে সে এম. এ. দিবে এই তার পণ।
দেহ তার ছিপ্‌ছিপে,
চলা তার চটুল চকিত,
চশমার নিচে

চোখে তার ঝলমল কৌতুকের ছটা,—
দেহমন
কূলে কূলে ভরা তার হাসিতে খুশিতে ॥

তারি এক ভক্ত সখী নাম উমারানী—
শান্ত কণ্ঠস্বর,
চোখে স্নিগ্ধ কালো ছায়া,
ছুটি ছুটি সরু চুড়ি সুকুমার ছুটি তার হাতে।
পাঠ্য ছিল ফিলজফি,
সে কথা জানাতে তার বিষম সংকোচ ॥

দাদার গোপন কথাখানা
সুধার ছিল না অগোচর।
চেপে রেখেছিল হাসি,
পাছে হাসি তীব্র হয়ে বাজে তার মনে।
রবিবার
চা খেতে বন্ধুকে ডেকেছিল।
সেদিন বিষম বৃষ্টি,
রাস্তা গলি ভেসে যায় জলে,
একা জানালার পাশে সুনীত সেতারে
আলাপ করেছে শুরু সুরট মল্লার।
মন জানে,
উমা আছে পাশের ঘরেই।
সেই যে নিবিড় জানাটুকু
বুকের স্পন্দনে মিলে সেতারের তারে তারে কাঁপে ॥

হঠাৎ দাদার ঘরে ঢুকে
সেতারটা কেড়ে নিয়ে বলে সুধা,
"উমার বিশেষ অনুরোধ
গান শোনাতেই হবে,
নইলে সে ছাড়ে না কিছুতে।"
লজ্জায় সখীর মুখ রাঙা,
এ মিথ্যা কথার
কী করে যে প্রতিবাদ করা যায়
ভেবে সে পেল না ॥

সন্ধ্যার আগেই
অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে;
থেকে থেকে বাদল বাতাসে
দরজাটা ব্যস্ত হয়ে উঠে,
বৃষ্টির ঝাপটা লাগে কাঁচের সাশিতে;
বারান্দার টব থেকে মৃদুগন্ধ দেয় জুঁই ফুল;
হাঁটুজল জমেছে রাস্তায়,
তারি পর' দিয়ে
মাঝে মাঝে ছলোছলো শব্দে চলে গাড়ি ॥

দীপালোকহীন-ঘরে
সেতারের ঝংকারের সাথে
সুনীত ধরেছে গান
নটমল্লারের সুরে—
আওয়ে পিয়রওয়া,

রিমিঝিমি বরখন লাগে।
সুরের সুরেন্দ্রলোকে মন গেছে চলে,
নিখিলের সব ভাষা মিলে গেছে অখণ্ড সংগীতে।
অন্তহীন কালসরোবরে
মাধুরীর শতদল,—
তার 'পরে যে রয়েছে একা বসে
চেনা যেন তবু সে অচেনা॥

সন্ধ্যা হল।
বৃষ্টি থেমে গেছে;
জ্বলেছে পথের বাতি।
পাশের বাড়িতে
কোন্ ছেলে দুলে দুলে
চেঁচিয়ে ধরেছে তার পরীক্ষার পড়া॥

এমনসময় সিঁড়ি থেকে
অট্টহাস্যে এল হাঁক,
"কোথা ওরে, কোথা গেল হাঁসখালি।"
মাংসল-পৃথুল-দেহ বটেকৃষ্ট স্ফীত-রক্তচোখ
ঘরে এসে দেখে—
সুনীত দাঁড়িয়ে দ্বারে নিঃসংকোচ স্তব্ধ ঘৃণা নিয়ে
স্থূল বিদ্রূপের ঊর্ধ্বে
ইন্দ্রের উদ্যত বজ্র যেন।
জোর করে হেসে উঠে

কী কথা বলতে গেল বটু,
স্থনীত হাঁকল "চুপ"—
অকস্মাৎ বিদলিত ভেকের ডাকের মতো
হাসি গেল থেমে ।

৫ শ্রাবণ, ১৩৩৯

তীর্থযাত্রী

কন্‌কনে ঠাণ্ডায় আমাদের যাত্রা,
ভ্রমণটা বিষম দীর্ঘ, সময়টা সব চেয়ে খারাপ,
রাস্তা ঘোরালো, ধারালো বাতাসের চোট,
একেবারে দুর্জয় শীত ।
ঘাড়ে-ক্ষত পায়ে ব্যথা মেজাজ-চড়া উটগুলো
শুয়ে শুয়ে পড়ে গলা বরফে ।
মাঝে মাঝে মন যায় বিগড়ে
যখন মনে পড়ে পাহাড়তলিতে বসন্তমঞ্জিল, তার চাতাল;
আর শরবতের পেয়ালা হাতে রেশমি সাজে যুবতীর দল ।
এদিকে উটওয়ালারা গাল পাড়ে, গন্‌গন্‌ করে রাগে,
ছুটে পালায় মদ আর মেয়ের খোঁজে ।
মশাল যায় নিভে, মাথা রাখবার জায়গা জোটে না ।
নগরে যাই, সেখানে বৈরিতা ; নগরীতে সন্দেহ ;
গ্রামগুলো নোংরা, তারা চড়া দাম হাঁকে ।
কঠিন মুশকিল ।
শেষে ঠাওরালেম, চলব সারারাত ;
মাঝে মাঝে নেব ঝিমিয়ে,
আর কানে কানে কেউ বা গান গাবে—
এ সমস্তই পাগলামি ॥

ভোরের দিকে এলেম যেখানে মিঠে শীত সেই পাহাড়ের খদে,
সেখানে বরফসীমার নিচেটা ভিজে-ভিজে, ঘন গাছগাছালির গন্ধ ।
নদী চলেছে ছুটে, জলযন্ত্রের চাকা আঁধারকে মারছে চাপড় ।
দিগন্তের গায়ে তিনটে গাছ দাঁড়িয়ে ।

বুড়ো সাদা ঘোড়াটা মাঠ বেয়ে দৌড় দিয়েছে।
পৌঁছলেম শরাবখানায়, তার কপাটের মাথায় আঙুরলতা।
দুজন মানুষ খোলা দরোজার কাছে পাশা খেলছে টাকার লোভে,
পা দিয়ে ঠেলছে শূন্য মদের কুপো।
কোনো খবরই মিলল না সেখানে,
চললেম আরো আগে।
যেতে যেতে সন্ধে হল ;
সময় পেরিয়ে যায় যায়, তখন খুঁজে পেলেম জায়গাটা।
বলা যেতে পারে, ব্যাপারটা তৃপ্তিজনক ॥

মনে পড়ে এসব ঘটেছে অনেক কাল আগে,
আবার ঘটে যেন এই ইচ্ছে, কিন্তু লিখে রাখো,
এই লিখে রাখো,—এত দূরে যে আমাদের টেনে নিয়েছিল
সে কি জন্মের সন্ধানে না মৃত্যুর।
জন্ম একটা হয়েছিল বটে,
প্রমাণ পেয়েছি, সন্দেহ নেই।
এর আগে তো জন্মও দেখেছি, মৃত্যুও,—
মনে ভাবতেম তারা এক নয়।
কিন্তু এই যে জন্ম এ বড়ো কঠোর,
দারুণ এর যাতনা,মৃত্যুর মতো, আমাদের মৃত্যুর মতোই।
এলেম ফিরে আপন আপন দেশে, এই আমাদের রাজত্বগুলোয়।
আর কিন্তু স্বস্তি নেই সেই পুরানো বিধিবিধানে
যার মধ্যে আছে সব অনাত্মীয় আপন দেবদেবী আঁকড়ে ধ'রে।
আর-একবার মরতে পারলে আমি বাঁচি।

[১৩৩৯]

চিররূপের বাণী

প্রাঙ্গণে নামল অকাল সন্ধ্যার ছায়া,
সূর্যগ্রহণের কালিমার মতো।
উঠল ধ্বনি, খোলো দ্বার।
প্রাণপুরুষ ছিল ঘরের মধ্যে,
সে কেঁপে উঠল চমক খেয়ে।
দরজা ধরল চেপে,
আগলের উপর আগল লাগল।
কম্পিতকণ্ঠে বললে, কে তুমি।
মেঘমন্দ্রধ্বনি এল, আমি মাটি-রাজত্বের দূত,
সময় হয়েছে, এসেছি মাটির দেনা আদায় করতে।
ঝন্‌ঝন্‌ বেজে উঠল দ্বারের শিকল,
থরথর কাঁপল প্রাচীর,
হায়-হায় করে ঘরের হাওয়া।
নিশাচরের ডানার ঝাপট আকাশে আকাশে
নিশীথিনীর হৃৎকম্পনের মতো।
ধক্‌ধক্‌ ধক্‌ধক্‌ আঘাতে
খান্‌খান্‌ হল দ্বারের আগল, কপাট পড়ল ভেঙে॥

কম্পমান কণ্ঠে প্রাণ বললে, হে মাটি, হে নিষ্ঠুর, কী চাও তুমি।
দূত বললে, আমি চাই দেহ।
দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে প্রাণ, বললে,—
এতকাল আমার লীলা এই দেহে,
এর অণুতে অণুতে আমার নৃত্য,

নাড়িতে নাড়িতে ঝংকার,
মুহূর্তেই কি উৎসব দেবে ভেঙে,
দীর্ণ হয়ে যাবে বাঁশি,
চূর্ণ হয়ে যাবে মৃদঙ্গ,
ডুবে যাবে এর দিনগুলি
অতল রাত্রির অন্ধকারে।
দূত বললে, ঋণে বোঝাই তোমার এই দেহ,
শোধ করবার দিন এল।
মাটির ভাণ্ডারে ফিরবে তোমার দেহের মাটি।
প্রাণ বললে, মাটির ঋণ শোধ করে নিতে চাও, নাও—
কিন্তু তার চেয়ে বেশি চাও কেন।
দূত বিদ্রূপ করে বললে, এই তো তোমার নিঃস্ব দেহ,
কৃশ ক্লান্ত কৃষ্ণচতুর্দশীর চাঁদ—
এর মধ্যে বাহুল্য আছে কোথায়।
প্রাণ বললে, মাটিই তোমার, রূপ তো তোমার নয়।
অট্টহাস্যে হেসে উঠল দূত, বললে, যদি পার দেহ থেকে
রূপ নাও ছাড়িয়ে।
প্রাণ বললে, পারবই, এই পণ আমার॥

প্রাণের মিতা মন। সে গেল আলোক-উৎসের তীর্থে।
বললে জোড়হাত করে,—
হে মহাজ্যোতি, হে চিরপ্রকাশ, হে রূপের কল্পনির্ঝর,
স্থূল মাটির কাছে ঘটিয়ো না তোমার সত্যের অপলাপ,
তোমার সৃষ্টির অপমান।—
তোমার রূপকে লুপ্ত করে সে কোন্ অধিকারে,

আমাকে কাঁদায় কার অভিশাপে।
মন বসল তপস্যায়।
কেটে গেল হাজার বছর, লক্ষ বছর, প্রাণের কান্না থামে না।
পথে পথে বাটপাড়ি,
রূপ চুরি যায় নিমেষে নিমেষে।
সমস্ত জীবলোক থেকে প্রার্থনা ওঠে দিনরাত,—
হে রূপকার, হে রূপরসিক,
যে দান করেছ নিজহাতে, জড়দানব তাকে কেড়ে নিয়ে যায় যে।—
ফিরিয়ে আনো তোমার আপন ধন॥

যুগের পর যুগ গেল, নেমে এল আকাশবাণী,—
মাটির জিনিস ফিরে যায় মাটিতে,
ধ্যানের রূপ রয়ে যায় আমার ধ্যানে।—
বর দিলেম, হারা রূপ ধরা দেবে,
কায়ামুক্ত ছায়া আসবে আলোর বাহু ধরে
তোমার দৃষ্টির উৎসবে॥

রূপ এল ফিরে দেহহীন ছবিতে, উঠল শঙ্খধ্বনি।
ছুটে এল চারিদিক থেকে রূপের প্রেমিক॥

আবার দিন যায়, বৎসর যায়। প্রাণের কান্না থামে না।
আরো কী চাই।
প্রাণ জোড়হাত করে বলে,—
মাটির দূত আসে, নির্মম হাতে কণ্ঠযন্ত্রে কুলুপ লাগায়,
বলে 'কণ্ঠনালী আমার'।

শুনে আমি বলি, মাটির বাঁশিখানি তোমার বটে,
কিন্তু বাণী তো তোমার নয়।
উপেক্ষা ক'রে সে হাসে।
শোনো আমার ক্রন্দন, হে বিশ্ববাণী,
জয়ী হবে কি জড়মাটির অহংকার।
সেই অন্ধ সেই মূক তোমার বাণীর উপর কি চাপা দেবে চিরমূকত্ব—
যে-বাণী অমৃতের বাহন তার বুকের উপর স্থাপন করবে
জড়ের জয়স্তম্ভ ॥

শোনা গেল আকাশ থেকে,—
ভয় নেই।
বায়ুসমুদ্রে ঘুরে ঘুরে চলে অশ্রুতবাণীর চক্রলহরী,
কিছুই হারায় না।
আশীর্বাদ এই আমার, সার্থক হবে মনের সাধনা।
জীর্ণকণ্ঠ মিশবে মাটিতে, চিরজীবী কণ্ঠস্বর বহন করবে বাণী ॥

মাটির দানব মাটির রথে যাকে হরণ করে চলেছিল
মনের রথ সেই নিরুদ্দেশ বাণীকে আনলে ফিরিয়ে কণ্ঠহীন গানে।
জয়ধ্বনি উঠল মর্ত্যলোকে।
দেহমুক্ত রূপের সঙ্গে যুগলমিলন হল দেহমুক্ত বাণীর
প্রাণতরঙ্গিণীর তীরে দেহনিকেতনের প্রাঙ্গণে ॥

[১৩৩৯]

শুচি

রামানন্দ পেলেন গুরুর পদ,—
সারাদিন তাঁর কাটে জপে তপে,
সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুরকে ভোজ্য করেন নিবেদন,
তার পরে ভাঙে তাঁর উপবাস
যখন অন্তরে পান ঠাকুরের প্রসাদ ॥

সেদিন মন্দিরে উৎসব,
রাজা এলেন, রানী এলেন,
এলেন পণ্ডিতেরা দূর দূর থেকে,
এলেন নানাচিহ্নধারী নানা সম্প্রদায়ের ভক্তদল।
সন্ধ্যাবেলায় স্নান শেষ করে
রামানন্দ নৈবেদ্য দিলেন ঠাকুরের পায়ে,—
প্রসাদ নামল না তাঁর অন্তরে।
আহার হল না সেদিন ॥

এমনি যখন দুই সন্ধ্যা গেল কেটে,
হৃদয় রইল শুষ্ক হয়ে,
গুরু বললেন মাটিতে ঠেকিয়ে মাথা,
"ঠাকুর, কী অপরাধ করেছি।"
ঠাকুর বললেন, "আমার বাস কি কেবল বৈকুণ্ঠে।
সেদিন আমার মন্দিরে যারা প্রবেশ পায়নি
আমার স্পর্শ যে তাদের সর্বাঙ্গে,
আমারই পাদোদক নিয়ে

প্রাণপ্রবাহিণী বইছে তাদের শিরায়।
তাদের অপমান আমাকে বেজেছে,
আজ তোমার হাতের নৈবেদ্য অশুচি।"

"লোকস্থিতি রক্ষা করতে হবে যে প্রভু"
ব'লে গুরু চেয়ে রইলেন ঠাকুরের মুখের দিকে।
ঠাকুরের চক্ষু দীপ্ত হয়ে উঠল, বললেন,
"যে লোকসৃষ্টি স্বয়ং আমার,
যার প্রাঙ্গণে সকল মানুষের নিমন্ত্রণ,
তার মধ্যে তোমার লোকস্থিতির বেড়া তুলে
আমার অধিকারে সীমা দিতে চাও,
এতবড়ো স্পর্ধা!"
রামানন্দ বললেন, "প্রভাতেই যাব এই সীমা ছেড়ে,
দেব আমার অহংকার দূর করে তোমার বিশ্বলোকে।"

তখন রাত্রি তিন-প্রহর,
আকাশের তারাগুলি যেন ধ্যানমগ্ন,
গুরুর নিদ্রা গেল ভেঙে, শুনতে পেলেন,
"সময় হয়েছে, ওঠো, প্রতিজ্ঞা পালন করো।"
রামানন্দ হাতজোড় করে বললেন, "এখনো রাত্রি গভীর,
পথ অন্ধকার, পাখিরা নীরব।
প্রভাতের অপেক্ষায় আছি।"
ঠাকুর বললেন, "প্রভাত কি রাত্রির অবসানে।
যখনি চিত্ত জেগেছে, শুনেছ বাণী
তখনি এসেছে প্রভাত।
যাও তোমার ব্রতপালনে।"

রামানন্দ বাহির হলেন পথে একাকী,
মাথার উপরে জাগে ধ্রুবতারা।
পার হয়ে গেলেন নগর, পার হয়ে গেলেন গ্রাম।
নদীতীরে শ্মশান, চণ্ডাল শবদাহে ব্যাপৃত।
রামানন্দ দুই হাত বাড়িয়ে তাকে নিলেন বক্ষে।
সে ভীত হয়ে বললে, "প্রভু, আমি চণ্ডাল, নাভা আমার নাম,
হেয় আমার বৃত্তি,
অপরাধী করবেন না আমাকে।"
গুরু বললেন, "অন্তরে আমি মৃত, অচেতন আমি,
তাই তোমাকে দেখতে পাইনি এতকাল,
তাই তোমাকেই আমার প্রয়োজন,
নইলে হবে না মৃতের সৎকার।"

চললেন গুরু আগিয়ে।
ভোরের পাখি উঠল ডেকে,
অরুণ-আলোয় শুকতারা গেল মিলিয়ে।
কবীর বসেছেন তার প্রাঙ্গণে,
কাপড় বুনছেন আর গান গাইছেন গুন্ গুন্ স্বরে।
রামানন্দ বসলেন পাশে,
কণ্ঠ তাঁর ধরলেন জড়িয়ে।
কবীর ব্যস্ত হয়ে বললেন,
"প্রভু, জাতিতে আমি মুসলমান,
আমি জোলা, নীচ আমার বৃত্তি।"
রামানন্দ বললেন, "এতদিন তোমার সঙ্গ পাইনি, বন্ধু,
তাই অন্তরে আমি নগ্ন,

চিত্ত আমার ধুলায় মলিন,
আজ আমি পরব শুচিবস্ত্র তোমার হাতে,
আমার লজ্জা যাবে দূর হয়ে।”

শিষ্যেরা খুঁজতে খুঁজতে এল সেখানে,
ধিক্‌কার দিয়ে বললে, “এ কী করলেন, প্রভু।”
রামানন্দ বললেন, “আমার ঠাকুরকে এতদিন যেখানে হারিয়েছিলুম,
আজ তাঁকে সেখানে পেয়েছি খুঁজে।”
সূর্য উঠল আকাশে,
আলো এসে পড়ল গুরুর আনন্দিত মুখে।

[অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯]

রংরেজিনি

শংকরলাল দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত।
শাণিত তাঁর বুদ্ধি
শ্যেন পাখির চঞ্চুর মতো,—
বিপক্ষের যুক্তির উপর পড়ে বিদ্যুতদ্বেগে,
তার পক্ষ দেয় ছিন্ন করে,
ফেলে তাকে ধুলোয়।
রাজবাড়িতে নৈয়ায়িক এসেছে দ্রাবিড় থেকে।
বিচারে যার জয় হবে সে পাবে রাজার জয়পত্রী।
আহ্বান স্বীকার করেছেন শংকর,
এমনসময় চোখে পড়্‌ল পাগড়ি তাঁর মলিন।
গেলেন রংরেজির ঘরে॥

কুসুমফুলের খেত, মেহেদিবেড়ায় ঘেরা।
প্রান্তে থাকে জসীম রংরেজি।
মেয়ে তার আমিনা, বয়স তার সতেরো।
সে গান গায় আর রঙ বাঁটে,
রঙের সঙ্গে রঙ মেলায়।
বেণীতে তার লাল সুতোর ঝালর,
চেলি তার বাদামি রঙের,
শাড়ি তার আসমানি।
বাপ কাপড় রাঙায়,
রঙের বাটি জুগিয়ে দেয় আমিনা॥

শংকর বললেন, "জসীম,
পাগড়ি রাঙিয়ে দাও জাফরানি রঙে,
রাজসভায় ডাক পড়েছে।"

কুলকুল করে জল আসে নালা বেয়ে
কুসুমফুলের খেতে।
আমিনা পাগড়ি ধুতে গেল
নালার ধারে তুঁত গাছের ছায়ায় বসে।
ফাগুনের রৌদ্র ঝলক দেয় জলে,
ঘুঘু ডাকে দূরের আমবাগানে।
ধোওয়ার কাজ হল, প্রহর গেল কেটে।
পাগড়ি যখন বিছিয়ে দিল ঘাসের 'পরে
রংরেজিনি দেখল তারি কোণে
লেখা আছে একটি শ্লোকের একটি চরণ,—
"তোমার শ্রীপদ মোর ললাটে বিরাজে।"
বসে বসে ভাবল অনেকক্ষণ,
ঘুঘু ডাকতে লাগল আমের ডালে।
রঙিন সুতো ঘরের থেকে এনে
আরেক চরণ লিখে দিল,—
"পরশ পাইনে তাই হৃদয়ের মাঝে।"

দুদিন গেল কেটে।
শংকর এল রংরেজির ঘরে।
শুধালো, "পাগড়িতে কার হাতের লেখা?"
জসীমের ভয় লাগল মনে।

সেলাম করে বললে, "পণ্ডিতজি,
অবুঝ আমার মেয়ে,
মাপ করো ছেলেমানুষি।
চলে যাও রাজসভায়—
সেখানে এ লেখা কেউ দেখবে না, কেউ বুঝবে না।"
শংকর আমিনার দিকে চেয়ে বললে,
"রংরেজিনি,
অহংকারের-পাকে-ঘেরা ললাট থেকে
নামিয়ে এনেছ
শ্রীচরণের স্পর্শখানি হৃদয়তলে
তোমার হাতের রাঙা রেখার পথে।
রাজবাড়ির পথ আমার হারিয়ে গেল,—
আর পাব না খুঁজে।"

২৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯

মুক্তি

বাজিরাও পেশোয়ার অভিষেক হবে
কাল সকালে ॥

কীর্তনি এসেছে গ্রামের থেকে,—
মন্দিরে ছিল না তার স্থান।
সে বসেছে অঙ্গনের এক কোণে
পিপুলগাছের তলায়।
একতারা বাজায় আর কেবল সে ফিরে ফিরে বলে,
"ঠাকুর, তোমায় কে বসালো
কঠিন সোনার সিংহাসনে।"
রাত তখন দুই-প্রহর,
শুক্লপক্ষের চাঁদ গেছে অস্তে।
দূরে রাজবাড়ির তোরণে
বাজছে শাঁক শিঙে জগঝম্প,
জ্বলছে প্রদীপের মালা ॥

কীর্তনি গাইছে,
"তমালকুঞ্জে বনের পথে
শ্যামল ঘাসের কান্না এলেম শুনে,—
ধুলোয় তারা ছিল যে কান পেতে,
পায়ের চিহ্ন বুকে পড়বে আঁকা,
এই ছিল প্রত্যাশা।"

আরতি হয়ে গেছে সারা,
মন্দিরের দ্বার তখন বন্ধ,
ভিড়ের লোক গেছে রাজবাড়িতে।
কীর্তনি আপন মনে গাইছে,
"প্রাণের ঠাকুর,
এরা কি পাথর গেঁথে তোমায় রাখবে বেঁধে।
তুমি যে স্বর্গ ছেড়ে নামলে ধুলোয়
তোমার পরশ আমার পরশ
মিলবে বলে।"

সেই পিপুলতলার অন্ধকারে
একা একা গাইছিল কীর্তনি,
আর শুনছিল আরেকজনা গোপনে—
বাজিরাও পেশোয়া॥

শুনছিল সে,—
"তুমি আমায় ডাক দিয়েছ আগল-দেওয়া ঘরের থেকে।
আমায় নিয়ে পথের পথিক হবে।
ঘুচবে তোমার নির্বাসনের ব্যথা,
ছাড়া পাবে হৃদয়মাঝে।
থাক্‌গে ওরা পাথরখানা নিয়ে
পাথরের বন্দিশালায়
অহংকারের-কাঁটার-বেড়া-ঘেরা।"

রাত্রি প্রভাত হল।
শুকতারা অরুণ-আলোয় উদাসী।
তোরণদ্বারে বাজল বাঁশি বিভাসে ললিতে।
অভিষেকের স্নান হবে—
পুরোহিত এল তীর্থবারি নিয়ে॥

রাজবাড়ির ঠাকুরঘর শূন্য।
জ্বলছে দীপশিখা,
পূজার উপচার পড়ে আছে,
বাজিরাও পেশোয়া গেছে চলে
পথের পথিক হয়ে।

১৪ মাঘ, ১৩৩৯

প্রেমের সোনা

রবিদাস চামার ঝাঁট দেয় ধুলো।
সজন রাজপথ বিজন তার কাছে,
পথিকেরা চলে তার স্পর্শ বাঁচিয়ে।
গুরু রামানন্দ প্রাতঃস্নান সেরে
চলেছেন দেবালয়ের পথে,—
দূর থেকে রবিদাস প্রণাম করল তাঁকে,
ধুলায় ঠেকালো মাথা।
রামানন্দ শুধালেন, "বন্ধু, কে তুমি।"
উত্তর পেলেন, "আমি, শুকনো ধুলো—
প্রভু, তুমি আকাশের মেঘ,
ঝরে যদি তোমার প্রেমের ধারা
গান গেয়ে উঠবে বোবা ধুলো
রঙবেরঙের ফুলে।"
রামানন্দ নিলেন তাকে বুকে,
দিলেন তাকে প্রেম।
রবিদাসের প্রাণের কুঞ্জবনে
লাগল যেন গীতবসন্তের হাওয়া॥

চিতোরের রানী, ঝালি তাঁর নাম।
গান পৌঁছল কানে,
তাঁর মন করে দিল উদাস।
ঘরের কাজে মাঝে মাঝে
ত্ব-চোখ দিয়ে জল পড়ে ঝ'রে।

মান গেল তাঁর কোথায় ভেসে।
রবিদাস চামারের কাছে
হরিপ্রেমের দীক্ষা নিলেন রাজরানী॥

স্মৃতিশিরোমণি
রাজকুলের বৃদ্ধ পুরোহিত,
বললে, "ধিক, মহারানী, ধিক।
জাতিতে অন্ত্যজ রবিদাস,
ফেরে পথে পথে, ঝাঁট দেয় ধুলো,
তাকে তুমি প্রণাম করলে গুরু ব'লে!
ব্রাহ্মণের হেঁট হল মাথা
এ রাজ্যে তোমার।"

রানী বললেন, "ঠাকুর, শোনো তবে,
আচারের হাজার গ্রন্থি
দিনরাত্রি বাঁধ কেবল শক্ত করে—
প্রেমের সোনা কখন পড়ল খসে
জানতে পারনি তা।
আমার ধুলোমাখা গুরু
ধুলোর থেকে কুড়িয়ে পেয়েছে।
অর্থহারা বাঁধনগুলোর গর্বে, ঠাকুর,
থাকো তুমি কঠিন হয়ে।
আমি সোনার কাঙালিনি
ধুলোর সে দান নিলেম মাথায় করে।"

[মাঘ, ১৩৩৯]

স্নানসমাপন

গুরু রামানন্দ স্তব্ধ দাঁড়িয়ে
গঙ্গার জলে পূর্বমুখে।
তখন জলে লেগেছে সোনার কাঠির ছোঁওয়া,
ভোরের হাওয়ায় স্রোত উঠছে ছল্‌ছল্‌ করে।
রামানন্দ তাকিয়ে আছেন
জবাকুসুমসংকাশ সূর্যোদয়ের দিকে।
মনে মনে বলছেন,
"হে দেব, তোমার যে কল্যাণতম রূপ
সে তো আমার অন্তরে প্রকাশ পেল না।
ঘোচাও তোমার আবরণ।"

সূর্য উঠল শালবনের মাথার উপর।
জেলেরা নৌকায় পাল দিলে তুলে,
বকের পাঁতি উড়ে চলেছে সোনার আকাশ বেয়ে
ওপারে জলার দিকে।
এখনো স্নান হল না সারা।
শিষ্য শুধালো, "বিলম্ব কেন প্রভু,
পূজার সময় যায় বয়ে।"
রামানন্দ উত্তর করলেন,
"শুচি হয়নি তনু,
গঙ্গা রইলেন আমার হৃদয় থেকে দূরে।"
শিষ্য বসে ভাবে, এ কেমন কথা॥

সর্ষেখেতে রৌদ্র ছড়িয়ে গেল।

মালিনি খুলেছে ফুলের পসরা পথের ধারে,
গোয়ালিনি যায় দুধের কলস মাথায় নিয়ে।
গুরুর কী হল মনে,
উঠলেন জল ছেড়ে,
চললেন বনঝাউ ভেঙে
গাংশালিকের কোলাহলের মধ্য দিয়ে।
শিষ্য শুধালো, "কোথায় যাও, প্রভু,—
ওদিকে তো নেই ভদ্রপাড়া।"
গুরু বললেন, "চলেছি স্নানসমাপনের পথে।"

বালুচরের প্রান্তে গ্রাম।
গলির মধ্যে প্রবেশ করলেন গুরু।
সেখানে তেঁতুলগাছের ঘন ছায়া,
শাখায় শাখায় বানরদলের লাফালাফি।
গলি পৌঁছয় ভাজন মুচির ঘরে।
পশুর চামড়ার গন্ধ আসছে দূর থেকে।
আকাশে চিল উড়ছে পাক দিয়ে,
রোগা কুকুর হাড় চিবোচ্ছে পথের পাশে।
শিষ্য বললে, "রাম, রাম!"
ভ্রূকুটি করে দাঁড়িয়ে রইল গ্রামের বাইরে॥

ভাজন লুটিয়ে প'ড়ে গুরুকে প্রণাম করলে
সাবধানে।
গুরু তাকে বুকে নিলেন তুলে।

ভাজন ব্যস্ত হয়ে উঠল,
"কী করলেন প্রভু,
অধমের ঘরে মলিনের গ্লানি লাগল পুণ্যদেহে।"
রামানন্দ বললেন,
"স্নানে গেলেম তোমার পাড়া দূরে রেখে,
তাই যিনি সবাইকে দেন ধৌত ক'রে
তাঁর সঙ্গে মনের মিল হল না।
এতক্ষণে তোমার দেহে আমার দেহে
বইল সেই বিশ্বপাবনধারা।
ভগবান সূর্যকে আজ প্রণাম করতে গিয়ে প্রণাম বেধে গেল।
বললেম, হে দেব, তোমার মধ্যে যে জ্যোতি আমার মধ্যেও তিনি।
তবুও আজ দেখা হল না কেন।
এতক্ষণে মিলল তাঁর দর্শন
তোমার ললাটে আর আমার ললাটে।
মন্দিরে আর হবে না যেতে।"

১৫ ফাল্গুন, ১৩৩৯

প্রথম পূজা

ত্রিলোকেশ্বরের মন্দির।
লোকে বলে স্বয়ং বিশ্বকর্মা তার ভিতপত্তন করেছিলেন
কোন্ মান্ধাতার আমলে,—
স্বয়ং হনুমান এনেছিলেন তার পাথর বহন করে।
ইতিহাসের পণ্ডিত বলেন, এ মন্দির কিরাতজাতের গড়া,
এ দেবতা কিরাতের।
একদা যখন ক্ষত্রিয় রাজা জয় করলেন দেশ—
দেউলের আঙিনা পূজারিদের রক্তে গেল ভেসে,
দেবতা রক্ষা পেলেন নতুন নামে, নতুন পূজাবিধির আড়ালে,—
হাজার বৎসরের প্রাচীন ভক্তিধারার স্রোত গেল ফিরে।
কিরাত আজ অস্পৃশ্য, এ মন্দিরে তার প্রবেশপথ লুপ্ত॥

কিরাত থাকে সমাজের বাইরে,
নদীর পূর্বপারে তার পাড়া।
সে ভক্ত— আজ তার মন্দির নেই, তার গান আছে।
নিপুণ তার হাত, অভ্রান্ত তার দৃষ্টি।
সে জানে কী করে পাথরের উপর পাথর বাঁধে,
কী করে পিতলের উপর রুপোর ফুল তোলা যায়,
কৃষ্ণশিলায় মূর্তি গড়বার ছন্দটা কী।
রাজশাসন তার নয়, অস্ত্র তার নিয়েছে কেড়ে;
বেশে বাসে ব্যবহারে সম্মানের চিহ্ন হতে সে বর্জিত;
বঞ্চিত সে পুঁথির বিদ্যায়।
ত্রিলোকেশ্বর-মন্দিরের স্বর্ণচূড়া পশ্চিমদিগন্তে যায় দেখা—

চিনতে পারে নিজেদেরই মনের আকল্প,
বহু দূরের থেকে প্রণাম করে ॥

কার্তিক পূর্ণিমা, পূজার উৎসব।
মঞ্চের উপরে বাজছে বাঁশি, মৃদঙ্গ, করতাল ;
মাঠ জুড়ে কানাতের পর কানাত,
মাঝে মাঝে উঠছে ধ্বজা।
পথের দুইধারে ব্যাপারিদের পসরা—
তামার পাত্র, রুপোর অলংকার, দেবমূর্তির পট, রেশমের কাপড় ;
ছেলেদের খেলার জন্যে কাঠের ডমরু, মাটির পুতুল, পাতার বাঁশি ;
অর্ঘ্যের উপকরণ, ফল, মালা, ধূপ, বাতি, ঘড়াঘড়া তীর্থবারি।
বাজিকর তারস্বরে প্রলাপবাক্যে দেখাচ্ছে বাজি ;
কথক পড়ছে রামায়ণকথা।
উজ্জ্বলবেশে সশস্ত্র প্রহরী ঘুরে বেড়ায় ঘোড়ায় চড়ে।
রাজ-অমাত্য হাতির উপর হাওদায় ;
সম্মুখে বেজে চলেছে শিঙা।
কিংখাবে-ঢাকা পালকিতে ধনীঘরের গৃহিণী ;
আগে পিছে কিংকরের দল।
সন্ন্যাসীর ভিড় পঞ্চবটের তলায়—
নগ্ন, জটাধারী, ছাইমাখা ;
মেয়েরা পায়ের কাছে ভোগ রেখে যায়—
ফল, দুধ, মিষ্টান্ন, ঘি, আতপতণ্ডুল।
থেকে থেকে আকাশে উঠছে চীৎকারধ্বনি,—
জয় ত্রিলোকেশ্বরের জয়।
কাল আসবে শুভলগ্নে রাজার প্রথম পূজা ;

স্বয়ং আসবেন মহারাজা রাজহস্তীতে চড়ে।
তাঁর আগমনপথের দুইধারে
সারি সারি কলার গাছে ফুলের মালা,
মঙ্গলঘটে আম্রপল্লব;
আর ক্ষণে ক্ষণে পথের ধুলায় সেচন করছে গন্ধবারি ॥

শুক্লত্রয়োদশীর রাত।
মন্দিরের প্রথম প্রহরের ঘণ্টা ভেরী পটহ থেমেছে।
আজ চাঁদের উপরে একটা ঘোলা আবরণ,
জ্যোৎস্না আজ ঝাপসা—
যেন মূর্ছার ঘোর লাগল।
বাতাস রুদ্ধ—
ধোঁয়া জমে আছে আকাশে;
গাছপালাগুলো যেন শঙ্কায় আড়ষ্ট।
কুকুর অকারণে আর্তনাদ করছে;
ঘোড়াগুলো কান খাড়া করে উঠছে ডেকে
কোন্ অলক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে।
হঠাৎ গম্ভীর ভীষণ শব্দ শোনা গেল মাটির নিচে,
পাতালে দানবেরা যেন রণদামামা বাজিয়ে দিলে—
গুরু গুরু গুরু গুরু।
মন্দিরে শঙ্খঘণ্টা বাজতে লাগল প্রবলশব্দে।
হাতি বাঁধা ছিল,
তারা বন্ধন ছিঁড়ে গর্জন করতে করতে
ছুটল চারদিকে
যেন ঘূর্ণিঝড়ের মেঘ।

তুফান উঠল মাটিতে—
ছুটল উট মহিষ গোরু ছাগল ভেড়া
ঊর্ধ্বশ্বাসে, পালে পালে।
হাজার হাজার দিশাহারা লোক
আর্তস্বরে ছুটে বেড়ায়;
চোখে তাদের ধাঁধা লাগে,
আত্মপরের ভেদ হারিয়ে কে কাকে দেয় দ'লে।
মাটি ফেটে ফেটে ওঠে ধোঁয়া, ওঠে গরমজল—
ভীমসরোবরের দিঘি বালির নিচে গেল শুষে।
মন্দিরের চূড়ায় বাঁধা বড়ো ঘণ্টা দুলতে দুলতে
বাজতে লাগল ঢঙ ঢঙ।
আচমকা ধ্বনি থামল একটা ভেঙে-পড়ার শব্দে।
পৃথিবী যখন স্তব্ধ হল
পূর্ণপ্রায় চাঁদ তখন হেলেছে পশ্চিমের দিকে।
আকাশে উঠছে জ্বলে-ওঠা কানাতগুলোর ধোঁয়ার কুণ্ডলী,
জ্যোৎস্নাকে যেন অজগর সাপে জড়িয়েছে॥

পরদিন আত্মীয়দের বিলাপে দিগ্বিদিক যখন শোকার্ত,
তখন রাজসৈনিকদল মন্দির ঘিরে দাঁড়ালো,
পাছে অশুচিতার কারণ ঘটে।
রাজমন্ত্রী এল, দৈবজ্ঞ এল, স্মার্তপণ্ডিত এল।
দেখলে, বাহিরের প্রাচীর ধূলিসাৎ।
দেবতার বেদির উপরে ছাদ পড়েছে ভেঙে।
পণ্ডিত বললে, সংস্কার করা চাই আগামী পূর্ণিমার পূর্বেই,
নইলে দেবতা পরিহার করবেন তাঁর মূর্তিকে।

রাজা বললেন, "সংস্কার করো।"
মন্ত্রী বললেন, "ওই কিরাতরা ছাড়া কে করবে পাথরের কাজ।
ওদের দৃষ্টিকলুষ থেকে দেবতাকে রক্ষা করব কী উপায়ে।
কী হবে মন্দিরসংস্কারে যদি মলিন হয় দেবতার অঙ্গমহিমা।"

কিরাতদলপতি মাধবকে রাজা আনলেন ডেকে।
বৃদ্ধ মাধব, শুক্লকেশের উপর নির্মল সাদা চাদর জড়ানো,—
পরিধানে পীতধড়া, তাম্রবর্ণ দেহ কটি পর্যন্ত অনাবৃত,
দুই চক্ষু সকরুণ নম্রতায় পূর্ণ;
সাবধানে রাজার পায়ের কাছে রাখলে একমুঠো কুন্দফুল,
প্রণাম করলে স্পর্শ বাঁচিয়ে।
রাজা বললেন, "তোমরা না হলে দেবালয় সংস্কার হয় না।"
"আমাদের 'পরে দেবতার ঐ কৃপা"
এই ব'লে দেবতার উদ্দেশে মাধব প্রণাম জানালে।
নৃপতি নৃসিংহরায় বললেন, "চোখ বেঁধে কাজ করা চাই;
দেবমূর্তির উপর দৃষ্টি না পড়ে। পারবে?"
মাধব বললে, "অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে কাজ করিয়ে নেবেন অন্তর্যামী।
যতক্ষণ কাজ চলবে, চোখ খুলব না।"

বাহিরে কাজ করে কিরাতের দল,
মন্দিরের ভিতরে কাজ করে মাধব,
তার দুই চক্ষু পাকে পাকে কালো কাপড়ে বাঁধা।
দিনরাত সে মন্দিরের বাহিরে যায় না:
ধ্যান করে, গান গায়, আর তার আঙুল চলতে থাকে।
মন্ত্রী এসে বলে, "ত্বরা করো, ত্বরা করো।

তিথির পরে তিথি যায়, কবে লগ্ন হবে উত্তীর্ণ।"
মাধব জোড় হাতে বলে, "যাঁর কাজ তাঁরই নিজের আছে ত্বরা,
আমি তো উপলক্ষ।"

অমাবস্যা পার হয়ে শুক্লপক্ষ এল আবার।
অন্ধ মাধব আঙুলের স্পর্শ দিয়ে পাথরের সঙ্গে কথা কয়,
পাথর তার সাড়া দিতে থাকে।
কাছে দাঁড়িয়ে থাকে প্রহরী
পাছে মাধব চোখের বাঁধন খোলে!
পণ্ডিত এসে বললে, "একাদশীর রাত্রে প্রথম পূজার শুভক্ষণ।
কাজ কি শেষ হবে তার পূর্বে।"
মাধব প্রণাম করে বললে, "আমি কে যে উত্তর দেব।
কৃপা যখন হবে সংবাদ পাঠাব যথাসময়ে;
তার আগে এলে ব্যাঘাত হবে, বিলম্ব ঘটবে।"

ষষ্ঠী গেল, সপ্তমী পেরোল;
মন্দিরের দ্বার দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়ে
মাধবের শুক্লকেশে।
সূর্য অস্ত গেল, পাণ্ডুর আকাশে একাদশীর চাঁদ।
মাধব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে,—
"যাও প্রহরী, সংবাদ নিয়ে এসো গে,
মাধবের কাজ শেষ হল আজ।
লগ্ন যেন বয়ে না যায়।"

প্রহরী গেল।
মাধব খুলে ফেললে চোখের বন্ধন।

মুক্ত দ্বার দিয়ে পড়েছে একাদশীচাঁদের আলো
দেবমূর্তির উপরে।

মাধব হাঁটু গেড়ে বসল দুই হাত জোড় করে,
একদৃষ্টে চেয়ে রইল দেবতার মুখে,
দুই চোখে বইল জলের ধারা।
আজ হাজার বছরের ক্ষুধিত দেখা দেবতার সঙ্গে ভক্তের।
রাজা প্রবেশ করলেন মন্দিরে।
তখন মাধবের মাথা নত বেদীমূলে।
রাজার তলোয়ারে মুহূর্তে ছিন্ন হল সেই মাথা।
দেবতার পায়ে এই প্রথম পূজা, এই শেষ প্রণাম ॥

২৮ শ্রাবণ, ১৩৩৯
শান্তিনিকেতন

অস্থানে

একই লতাবিতান বেয়ে চামেলি আর মধুমঞ্জরী
দশটি বছর কাটিয়েছে গায়ে গায়ে ;
রোজ সকালে সূর্য-আলোর ভোজে
পাতাগুলি মেলে বলেছে,
এই তো এসেছি।
অধিকারের দ্বন্দ্ব ছিল ডালে ডালে দুই শরিকে,
তবু তাদের প্রাণের আনন্দে
রেষারেষির দাগ পড়েনি কিছু ॥

কখন যে কোন্ কুলগ্নে ঐ
সংশয়হীন অবোধ চামেলি
কোমল সবুজ ডাল মেলে দিল
বিজ্‌লিবাতির লোহার তারে তারে,
বুঝতে পারেনি যে ওরা জাত আলাদা ॥

শ্রাবণমাসের অবসানে আকাশকোণে
সাদা মেঘের গুচ্ছগুলি
নেমে নেমে পড়েছিল শালের বনে,
সেই সময়ে সোনার রাঙা স্বচ্ছ সকালে
চামেলি মেতেছিল অজস্র ফুলের গৌরবে।
কোথাও কিছু বিরোধ ছিল না,
মৌমাছিদের আনাগোনায়
উঠত কেঁপে শিউলিতলার ছায়া।

ঘুঘুর ডাকে দুই প্রহরে
বেলা হত আলস্যে শিথিল ॥

সেই ভরা শরতের দিনে সূর্য-ডোবার সময়
মেঘে মেঘে লাগল যখন নানা রঙের খেয়াল
সেই বেলাতে কখন এল
বিজ্‌লিবাতির অনুচরের দল।
চোখ রাঙালো চামেলিটার স্পর্ধা দেখে,—
শুষ্ক শূন্য আধুনিকের রূঢ় প্রয়োজনের 'পরে
নিত্যকালের লীলামধুর নিষ্প্রয়োজন অনধিকার
হাত বাড়ালো কেন।
তীক্ষ্ণ কুটিল আঁকশি দিয়ে
টেনে টেনে ছিনিয়ে ছিঁড়ে নিল
কচি কচি ডালগুলি সব ফুলে-ভরা।
এতদিনে বুঝল হঠাৎ অবোধ চামেলিটা
মৃত্যু-আঘাত বক্ষে নিয়ে,
বিজ্‌লিবাতির তারগুলো ঐ জাত আলাদা ॥

২৩ ভাদ্র, ১৩৩৯

ঘরছাড়া

এল সে জর্মনির থেকে
এই অচেনার মাঝখানে,
ঝড়ের মুখে নৌকো নোঙর-ছেঁড়া
ঠেকল এসে দেশান্তরে।
পকেটে নেই টাকা,
উদ্‌বেগ নেই মনে,
দিন চলে যায় দিনের কাজে
অল্পস্বল্প নিয়ে।
যেমন-তেমন থাকে
অন্য দেশের সহজ চালে।
নেই ন্যূনতা, গুমর কিছুই নেই;
মাথা উঁচু,
দ্রুত পায়ের চাল।
একটুও নেই অকিঞ্চনের অবসাদ।
দিনের প্রতি মুহূর্তকে
জয় করে সে আপন জোরে,
পথের মধ্যে ফেলে দিয়ে যায় সে চলে,
চায় না সে পিছন ফিরে,
রাখে না তার এক কণাও বাকি।
খেলাধুলা হাসিগল্প যা হয় যেখানে
তারি মধ্যে জায়গা সে নেয়
সহজ মানুষ।

কোথাও কিছু ঠেকে না তার
একটুকুও অনভ্যাসের বাধা।
একলা বটে তবুও তো
একলা সে নয়।
প্রবাসে তার দিনগুলো সব
হূহু করে কাটিয়ে দিচ্ছে হালকা মনে।
ওকে দেখে অবাক হয়ে থাকি,
সব মানুষের মধ্যে মানুষ
অভয় অসংকোচ,—
তার বাড়া ওর নেই তো পরিচয়॥

দেশের মানুষ এসেছে তার
আরেক জনা।
ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে
যা খুশি তাই ছবি এঁকে এঁকে,
যেখানে তার খুশি।
সে ছবি কেউ দেখে কিম্বা নাই দেখে,
ভালো বলে নাই বলে,
খেয়াল কিছুই নেই।
দুইজনেতে পাশাপাশি
কাঁকরঢালা পথ দিয়ে ঐ
যাচ্ছে চলে,
দুই টুকরো শরৎকালের মেঘ।
নয় ওরা তো শিকড়-বাঁধা গাছের মতো—
ওরা মানুষ;

ছুটি ওদের সকল দেশে, সকল কালে ;
কর্ম ওদের সবখানে ;
নিবাস ওদের সব মানুষের মাঝে।
মন যে ওদের স্রোতের মতো
সব কিছুরেই ভাসিয়ে চলে—
কোনোখানেই আটকা পড়ে না সে।
সব মানুষের ভিতর দিয়ে
আনাগোনার বড়ো রাস্তা তৈরি হবে ;
এরাই আছে সেই রাস্তার কাজে
এই যত-সব ঘরছাড়াদের দল॥

১৭ ভাদ্র, ১৩৩৯

ছুটির আয়োজন

কাছে এল পূজার ছুটি।
রোদ্‌দুরে লেগেছে চাঁপাফুলের রঙ।
হাওয়া উঠছে শিশিরে শিরশিরিয়ে,
শিউলির গন্ধ এসে লাগে
যেন কার ঠাণ্ডা হাতের কোমল সেবা।
আকাশের কোণে কোণে
সাদা মেঘের আলস্য,
দেখে মন লাগে না কাজে॥

মাস্টারমশায় পড়িয়ে চলেন
পাথুরে কয়লার আদিম কথা।
ছেলেটা বেঞ্চিতে পা দোলায়,
ছবি দেখে আপন মনে—
কমলদিঘির ফাটলধরা ঘাট,
আর ভঞ্জদের পাঁচিলঘেঁষা
আতাগাছের ফলে-ভরা ডাল।
আর দেখে সে মনে মনে, তিসির খেতে
গোয়ালপাড়ার ভিতর দিয়ে
রাস্তা গেছে এঁকেবেঁকে হাটের পাশে
নদীর ধারে॥

কলেজের ইকনমিক্‌স-ক্লাসে
খাতায় ফর্দ নিচ্ছে টুকে
চশমা-চোখে মেডেল-পাওয়া ছাত্র—
হালের লেখা কোন্‌ উপন্যাস কিনতে হবে,

ধারে মিলবে কোন্‌ দোকানে
'মনে-রেখো' পাড়ের শাড়ি,
সোনায়-জড়ানো শাঁখা
দিল্লির কাজ-করা লাল মখমলের চটি।
আর চাই রেশমে-বাঁধাই-করা
অ্যান্টিক কাগজে ছাপা কবিতার বই,
এখনো তার নাম মনে পড়ছে না॥

ভবানীপুরের তেতালা বাড়িতে
আলাপ চলছে সরু মোটা গলায়—
এবার আবু পাহাড়, না মাদুরা,
না ড্যালহৌসি কিম্বা পুরী,
না সেই চিরকেলে চেনা লোকের দার্জিলিঙ॥

আর দেখছি সামনে দিয়ে
স্টেশনে যাবার রাঙা রাস্তায়
শহরের দাদন-দেওয়া দড়িবাঁধা ছাগলছানা
পাঁচটা-ছটা ক'রে;
তাদের নিষ্ফল কান্নার স্বর ছড়িয়ে পড়ে
কাশের-ঝালর-দোলা শরতের শান্ত আকাশে।
কেমন ক'রে বুঝেছে তারা
এল তাদের পূজার ছুটির দিন॥

১৭ ভাদ্র, ১৩৩৯

মৃত্যু

মরণের ছবি মনে আনি।
ভেবে দেখি, শেষদিন ঠেকেছে শেষের শীর্ণক্ষণে
আছে ব'লে যত কিছু
রয়েছে দেশে কালে—
যত বস্তু, যত জীব, যত ইচ্ছা, যত চেষ্টা,
যত আশানৈরাশ্যের ঘাতপ্রতিঘাত
দেশে দেশে, ঘরে ঘরে, চিত্তে চিত্তে—
যত গ্রহনক্ষত্রের
দূর হতে দূরতর ঘূর্ণ্যমান স্তরে স্তরে
অগণিত অজ্ঞাত শক্তির
আলোড়ন আবর্তন
মহাকালসমুদ্রের কূলহীন বক্ষতলে
সমস্তই আমার এ চৈতন্যের
শেষ সূক্ষ্ম আকম্পিত রেখার এধারে।
এক পা তখনো আছে সে প্রান্তসীমায়,
অন্য পা আমার
বাড়িয়েছি রেখার ওধারে,
সেখানে অপেক্ষা করে অলক্ষিত ভবিষ্যৎ
নিয়ে দিনরজনীর অন্তহীন অক্ষমালা
আলো-অন্ধকারে-গাঁথা।
অসীমের অসংখ্য যা কিছু
সত্তায় সত্তায় গাঁথা
প্রসারিত অতীতে ও অনাগতে।

নিবিড় সে সমস্তের মাঝে
অকস্মাৎ আমি নেই।
এ কি সত্য হতে পারে।
উদ্ধত এ নাস্তিত্ব যে পাবে স্থান
এমন কি অণুমাত্র ছিদ্র আছে কোনোখানে।
সে-ছিদ্র কি এতদিনে
ডুবাতো না নিখিলতরণী
মৃত্যু যদি শূন্য হত,
যদি হত মহাসমগ্রের
রূঢ় প্রতিবাদ॥

২৬ ভাদ্র, ১৩৩৯

মানবপুত্র

মৃত্যুর পাত্রে খ্রীস্ট যেদিন মৃত্যুহীন প্রাণ উৎসর্গ করলেন
রবাহূত অনাহূতের জন্যে,
তার পরে কেটে গেছে বহুশত বৎসর।
আজ তিনি একবার নেমে এলেন নিত্যধাম থেকে মর্তধামে।
চেয়ে দেখলেন,
সেকালেও মানুষ ক্ষতবিক্ষত হত যে-সমস্ত পাপের মারে—
যে উদ্ধত শেল ও শল্য, যে চতুর ছোরা ও ছুরি,
যে ক্রূর কুটিল তলোয়ারের আঘাতে,
বিদ্যুদ্‌বেগে আজ তাদের ফলায় শান দেওয়া হচ্ছে
হিস্‌হিস্‌ শব্দে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে
বড়ো বড়ো মসীধূমকেতন কারখানাঘরে॥

কিন্তু দারুণতম যে মৃত্যুবাণ নূতন তৈরি হল,
ঝক্‌ঝক্‌ ক'রে উঠল নরঘাতকের হাতে,
পূজারি তাতে লাগিয়েছে তাঁরই নামের ছাপ
তীক্ষ্ণ নখে আঁচড় দিয়ে।
খ্রীস্ট বুকে হাত চেপে ধরলেন,—
বুঝলেন, শেষ হয়নি তাঁর নিরবচ্ছিন্ন মৃত্যুর মুহূর্ত,
নূতন শূল তৈরি হচ্ছে বিজ্ঞানশালায়,
বিঁধছে তাঁর গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে।
সেদিন তাঁকে মেরেছিল যারা
ধর্মমন্দিরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে
তারাই আজ নূতন জন্ম নিল দলে দলে,

তারাই আজ ধর্মমন্দিরের বেদির সামনে থেকে
পূজামন্ত্রের সুরে ডাকছে ঘাতক সৈন্যকে,
বলছে, "মারো, মারো।"
মানবপুত্র যন্ত্রণায় বলে উঠলেন ঊর্ধ্বে চেয়ে,
"হে ঈশ্বর, হে মানুষের ঈশ্বর,
কেন আমাকে ত্যাগ করলে।"

শ্রাবণ, ১৩৩৯

শিশুতীর্থ

রাত কত হল ?
উত্তর মেলে না।
কেননা, অন্ধ কাল যুগযুগান্তরের গোলকধাঁধায় ঘোরে, পথ অজানা,
পথের শেষ কোথায় খেয়াল নেই।
পাহাড়তলিতে অন্ধকার মৃত রাক্ষসের চক্ষুকোটরের মতো ,
স্তূপে স্তূপে মেঘ আকাশের বুক চেপে ধরেছে ;
পুঞ্জ পুঞ্জ কালিমা গুহায় গর্তে সংলগ্ন,
মনে হয়, নিশীথরাত্রের ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ;
দিগন্তে একটা আগ্নেয় উগ্রতা
ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে আর নেভে—
ও কি কোনো অজানা দুষ্টগ্রহের চোখরাঙানি।
ও কি কোনো অনাদি ক্ষুধার লেলিহ লোল জিহ্বা।
বিক্ষিপ্ত বস্তুগুলো যেন বিকারের প্রলাপ,
অসম্পূর্ণ জীবলীলার ধূলিবিলীন উচ্ছিষ্ট ;—
তারা অমিতাচারী দৃপ্ত প্রতাপের ভগ্ন তোরণ,
লুপ্ত নদীর বিস্মৃতিবিলগ্ন জীর্ণ সেতু,
দেবতাহীন দেউলের সর্পবিবরছিদ্রিত বেদি,
অসমাপ্ত দীর্ণ সোপানপংক্তি শূন্যতায় অবসিত।
অকস্মাৎ উচ্চণ্ড কলরব আকাশে আবর্তিত আলোড়িত হতে থাকে—
ও কি বন্দী বন্যাবারির গুহাবিদারণের রলরোল,
ও কি ঘূর্ণ্যতাণ্ডবী উন্মাদ সাধকের রুদ্রমন্ত্র-উচ্চারণ,
ও কি দাবাগ্নিবেষ্টিত মহারণ্যের আত্মঘাতী প্রলয়নিনাদ।

এই ভীষণ কোলাহলের তলে তলে একটা অস্ফুট ধ্বনিধারা বিসর্পিত—
যেন অগ্নিগিরিনিঃসৃত গদ্‌গদকলমুখর পঙ্কস্রোত ;
তাতে একত্রে মিলেছে পরশ্রীকাতরের কানাকানি, কুৎসিত জনশ্রুতি,
অবজ্ঞার কর্কশহাস্য।
সেখানে মানুষগুলো সব ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো
ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে,
মশালের আলোয় ছায়ায় তাদের মুখে
বিভীষিকার উল্কি পরানো।
কোনো একসময়ে অকারণ সন্দেহে কোনো-এক পাগল
তার প্রতিবেশীকে হঠাৎ মারে ;
দেখতে দেখতে নির্বিচারে বিবাদ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে দিকে দিকে।
কোনো নারী আর্তস্বরে বিলাপ করে ;
বলে, হায় হায়, আমাদের দিশাহারা সন্তান উচ্ছন্ন গেল।
কোনো কামিনী যৌবনমদবিলসিত নগ্ন দেহে অট্টহাস্য করে ;
বলে, কিছুতে কিছু আসে যায় না ॥

২

ঊর্ধ্বে গিরিচূড়ায় বসে আছে ভক্ত, তুষারশুভ্র নীরবতার মধ্যে ;
আকাশে তার নিদ্রাহীন চক্ষু খোঁজে আলোকের ইঙ্গিত।
মেঘ যখন ঘনীভূত, নিশাচর পাখি চীৎকারশব্দে যখন উড়ে যায়,
সে বলে, ভয় নেই ভাই, মানবকে মহান বলে জেনো।
ওরা শোনে না। বলে, পশুশক্তিই আদ্যাশক্তি। বলে, পশুই শাশ্বত।
বলে, সাধুতা তলে তলে আত্মপ্রবঞ্চক।
যখন ওরা আঘাত পায় বিলাপ করে বলে, ভাই, তুমি কোথায় ?
উত্তরে শুনতে পায়, আমি তোমার পাশেই।

অন্ধকারে দেখতে পায় না; তর্ক করে, এ বাণী ভয়ার্তের মায়াসৃষ্টি,
আত্মসান্ত্বনার বিড়ম্বনা।
বলে, মানুষ চিরদিন কেবল সংগ্রাম করবে
মরীচিকার অধিকার নিয়ে
হিংসাকণ্টকিত অন্তহীন মরুভূমির মধ্যে।

৬

মেঘ সরে গেল।
শুকতারা দেখা দিল পূর্বদিগন্তে,
পৃথিবীর বক্ষ থেকে উঠল আরামের দীর্ঘনিশ্বাস,
পল্লবমর্মর বনপথে-পথে হিল্লোলিত,
পাখি ডাক দিল শাখায় শাখায়।
ভক্ত বললে, সময় এসেছে।
কিসের সময়।
যাত্রার।
ওরা বসে ভাবলে।
অর্থ বুঝলে না, আপন আপন মনের মতো অর্থ বানিয়ে নিলে।
ভোরের স্পর্শ নামল মাটির গভীরে,
বিশ্বসত্তার শিকড়ে শিকড়ে কেঁপে উঠল প্রাণের চাঞ্চল্য।
কে জানে কোথা হতে একটি অতি সূক্ষ্মস্বর
সবার কানে কানে বললে,
চলো সার্থকতার তীর্থে।
এই বাণী জনতার কণ্ঠে কণ্ঠে
একটি মহৎ প্রেরণায় বেগবান হয়ে উঠল।
পুরুষেরা উপরের দিকে চোখ তুললে।

জোড় হাত মাথায় ঠেকালে মেয়েরা।
শিশুরা করতালি দিয়ে হেসে উঠল।
প্রভাতের প্রথম আলো ভক্তের মাথায় সোনার রঙের চন্দন পরালে;
সবাই বলে উঠল, ভাই, আমরা তোমার বন্দনা করি।

৪

যাত্রীরা চারিদিক থেকে বেরিয়ে পড়ল—
সমুদ্র পেরিয়ে, পর্বত ডিঙিয়ে, পথহীন প্রান্তর উত্তীর্ণ হয়ে—
এল নীলনদীর দেশ থেকে, গঙ্গার তীর থেকে,
তিব্বতের হিমমজ্জিত অধিত্যকা থেকে,
প্রাকাররক্ষিত নগরের সিংহদ্বার দিয়ে,
লতাজালজটিল অরণ্যে পথ কেটে।
কেউ আসে পায়ে হেঁটে, কেউ উটে, কেউ ঘোড়ায়, কেউ হাতিতে,
কেউ রথে চীনাংশুকের পতাকা উড়িয়ে।
নানা ধর্মের পূজারি চলল ধূপ জ্বালিয়ে, মন্ত্র প'ড়ে।
রাজা চলল, অনুচরদের বর্শাফলক রৌদ্রে দীপ্যমান,
ভেরী বাজে গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে।
ভিক্ষু আসে ছিন্ন কন্থা প'রে,
আর রাজ-অমাত্যের দল স্বর্ণলাঞ্ছনখচিত উজ্জ্বল বেশে।
জ্ঞানগরিমা ও বয়সের ভারে মন্থর অধ্যাপককে ঠেলে দিয়ে চলে
চটুলগতি বিদ্যার্থী যুবক।
মেয়েরা চলেছে কলহাস্যে, কত মাতা, কুমারী, কত বধূ;
থালায় তাদের শ্বেতচন্দন, ঝারিতে গন্ধসলিল।
বেশ্যাও চলেছে সেই সঙ্গে, তীক্ষ্ণ তাদের কণ্ঠস্বর,
অতিপ্রকট তাদের প্রসাধন।

চলেছে পঙ্গু খঞ্জ, অন্ধ আতুর,
আর সাধুবেশী ধর্মব্যবসায়ী
দেবতাকে হাটে হাটে বিক্রয় করা যাদের জীবিকা।
সার্থকতা!
স্পষ্ট ক'রে কিছু বলে না— কেবল নিজের লোভকে
মহৎ নাম ও বৃহৎ মূল্য দিয়ে ওই শব্দটার ব্যাখ্যা করে,
আর শাস্তিশঙ্কাহীন চৌর্যবৃত্তির অনন্ত সুযোগ ও আপন মলিন
ক্লিন্ন দেহমাংসের অক্লান্ত লোলুপতা দিয়ে কল্পস্বর্গ রচনা করে॥

৫

দয়াহীন দুর্গমপথ উপলখণ্ডে আকীর্ণ।
ভক্ত চলেছে, তার পশ্চাতে বলিষ্ঠ এবং শীর্ণ,
তরুণ এবং জরাজর্জর, পৃথিবী শাষণ করে যারা
আর যারা অর্ধাশনের মূল্যে মাটি চাষ করে।
কেউ বা ক্লান্ত বিক্ষতচরণ, কারও মনে ক্রোধ, কারও মনে সন্দেহ।
তারা প্রতি পদক্ষেপ গণনা করে আর শুধায়, কত পথ বাকি।
তার উত্তরে ভক্ত শুধু গান গায়।
শুনে তাদের ভ্রূ কুটিল হয়, কিন্তু ফিরতে পারে না ;
চলমান জনপিণ্ডের বেগ এবং অনতিব্যক্ত আশার তাড়না
তাদের ঠেলে নিয়ে যায়।
ঘুম তাদের কমে এল, বিশ্রাম তারা সংক্ষিপ্ত করলে ;
পরস্পরকে ছাড়িয়ে চলবার প্রতিযোগিতায় তারা ব্যগ্র ;
ভয়, পাছে বিলম্ব ক'রে বঞ্চিত হয়।
দিনের পর দিন গেল।

দিগন্তের পর দিগন্ত আসে,
অজ্ঞাতের আমন্ত্রণ অদৃশ্য সংকেতে ইঙ্গিত করে।
ওদের মুখের ভাব ক্রমেই কঠিন
আর ওদের গঞ্জনা উগ্রতর হতে থাকে ॥

৬

রাত হয়েছে।
পথিকেরা বটতলায় আসন বিছিয়ে বসল।
একটা দমকা হাওয়ায় প্রদীপ গেল নিবে, অন্ধকার নিবিড়
যেন নিদ্রা ঘনিয়ে উঠল মূর্ছায়।
জনতার মধ্য থেকে কে-একজন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে
অধিনেতার দিকে আঙুল তুলে বললে,
মিথ্যাবাদী, আমাদের প্রবঞ্চনা করেছ।
ভর্ৎসনা এক কণ্ঠ থেকে আরেক কণ্ঠে উদগ্র হতে থাকল।
তীব্র হল মেয়েদের বিদ্বেষ, প্রবল হল পুরুষের তর্জন।
অবশেষে একজন সাহসিক উঠে দাঁড়িয়ে
হঠাৎ তাকে মারলে প্রচণ্ড বেগে।
অন্ধকারে তার মুখ দেখা গেল না।
একজনের পর একজন উঠল, আঘাতের পর আঘাত করলে,
তার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।
রাত্রি নিস্তব্ধ।
ঝরনার কলশব্দ দূর থেকে ক্ষীণ হয়ে আসছে।
বাতাসে যূথীর মৃদুগন্ধ ॥

৭

যাত্রীদের মন শঙ্কায় অভিভূত।
মেয়েরা কাঁদছে ; পুরুষেরা উত্যক্ত হয়ে ভৎ সনা করছে, চুপ করো।
কুকুর ডেকে ওঠে ; চাবুক খেয়ে আর্ত কাকুতিতে
তার ডাক থেমে যায়।
রাত্রি পোহাতে চায় না।
অপরাধের অভিযোগ নি । মেয়ে পুরুষে তর্ক তীব্র হতে থাকে।
সবাই চীৎকার করে, গর্জ করে ;
শেষে যখন খাপ থেকে র বেরোতে চায়
এমনসময় অন্ধকার ক্ষীণ হল,
প্রভাতের আলো গিরিশৃঙ্গ ছাপিয়ে আকাশ ভরে দিলে।
হঠাৎ সকলে স্তব্ধ।
সূর্যরশ্মির তর্জনী এসে স্পর্শ করল
রক্তাক্ত মৃত মানুষের শান্ত ললাট।
মেয়েরা ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল, পুরুষেরা মুখ ঢাকল দুই হাতে।
কেউ বা অলক্ষিতে পালিয়ে যেতে চায়, পারে না ;
অপরাধের শৃঙ্খলে আপন বলির কাছে তারা বাঁধা।
পরস্পরকে তারা শুধায়, কে আমাদের পথ দেখাবে।
পূর্বদেশের বৃদ্ধ বললে,
আমরা যাকে মেরেছি সেই দেখাবে।
সবাই নিরুত্তর ও নতশির।
বৃদ্ধ আবার বললে, সংশয়ে তাকে আমরা অস্বীকার করেছি,
ক্রোধে তাকে আমরা হনন করেছি,
প্রেমে এখন আমরা তাকে গ্রহণ করব,

কেননা মৃত্যুর দ্বারা সে আমাদের সকলের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত
সেই মহামৃত্যুঞ্জয়।
সকলে দাঁড়িয়ে উঠল; কণ্ঠ মিলিয়ে গান করলে,—
জয় মৃত্যুঞ্জয়ের জয়॥

৮

তরুণের দল ডাক দিল; চলো যাত্রা করি, প্রেমের তীর্থে, শক্তির তীর্থে।
হাজার কণ্ঠের ধ্বনিনির্ঝরে ঘোষিত হল—
আমরা ইহলোক জয় করব এবং লোকান্তর।
উদ্দেশ্য সকলের কাছে স্পষ্ট নয়, কেবল আগ্রহে সকলে এক;
মৃত্যুবিপদকে তুচ্ছ করেছে সকলের সম্মিলিত সঞ্চলমান ইচ্ছার বেগ।
তারা আর পথ শুধায় না; তাদের মনে নেই সংশয়,
চরণে নেই ক্লান্তি।
মৃত অধিনেতার আত্মা তাদের অন্তরে বাহিরে;
সে যে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয়েছে
এবং জীবনের সীমাকে করেছে অতিক্রম।
তারা সেই ক্ষেত্র দিয়ে চলেছে যেখানে বীজ বোনা হল,
সেই ভাণ্ডারের পাশ দিয়ে যেখানে শস্য হয়েছে সঞ্চিত,
সেই অনুর্বর ভূমির উপর দিয়ে
যেখানে কঙ্কালসার দেহ বসে আছে প্রাণের কাঙাল;
তারা চলেছে প্রজাবহুল নগরের পথ দিয়ে;
চলেছে জনশূন্যতার মধ্যে দিয়ে
যেখানে বোবা অতীত তার ভাঙা কীর্তি কোলে নিয়ে নিস্তব্ধ;
চলেছে লক্ষ্মীছাড়াদের জীর্ণ বসতি বেয়ে
আশ্রয় যেখানে আশ্রিতকে বিদ্রূপ করে॥

রৌদ্রদগ্ধ বৈশাখের দীর্ঘ প্রহর কাটল পথে পথে।
সন্ধ্যাবেলায় আলোক যখন ম্লান তখন তারা কালজ্ঞকে শুধায়,
ওই কি দেখা যায় আমাদের চরম আশার তোরণচূড়া।
সে বলে, না, ও যে সন্ধ্যাভ্রশিখরে অস্তগামী সূর্যের বিলীয়মান আভা।
তরুণ বলে, থেমো না, বন্ধু, অন্ধ তমিস্র রাত্রির মধ্য দিয়ে
আমাদের পৌঁছতে হবে মৃত্যুহীন জ্যোতির্লোকে।
অন্ধকারে তারা চলে।
পথ যেন নিজের অর্থ নিজে জানে,
পায়ের তলার ধূলিও যেন নীরব স্পর্শে দিক চিনিয়ে দেয়।
স্বর্গপথযাত্রী নক্ষত্রের দল মূক সংগীতে বলে, সাথি, অগ্রসর হও।
অধিনেতার আকাশবাণী কানে আসে, আর বিলম্ব নেই॥

৯

প্রত্যুষের প্রথম আভা
অরণ্যের শিশিরবর্ষী পল্লবে পল্লবে ঝলমল করে উঠল।
নক্ষত্রসংকেতবিদ্ জ্যোতিষী বললে, বন্ধু, আমরা এসেছি।
পথের দুইধারে দিক্‌প্রান্ত অবধি
পরিণত শস্যশীর্ষ স্নিগ্ধ বায়ুহিল্লোলে দোলায়মান,—
আকাশের স্বর্ণলিপির উত্তরে ধরণীর আনন্দবাণী।
গিরিপদবর্তী গ্রাম থেকে নদীতলবর্তী গ্রাম পর্যন্ত
প্রতিদিনের লোকযাত্রা শান্ত গতিতে প্রবহমান।
কুমোরের চাকা ঘুরছে গুঞ্জনস্বরে,
কাঠুরিয়া হাটে আনছে কাঠের ভার,
রাখাল ধেনু নিয়ে চলেছে মাঠে,

বধূরা নদী থেকে ঘট ভ'রে যায় ছায়াপথ দিয়ে।
কিন্তু কোথায় রাজার দুর্গ, সোনার খনি,
মারণ-উচাটনমন্ত্রের পুরাতন পুঁথি ?
জ্যোতিষী বললে, নক্ষত্রের ইঙ্গিতে ভুল হতে পারে না,
তাদের সংকেত এইখানেই এসে থেমেছে।
এই বলে ভক্তিনম্রশিরে পথপ্রান্তে
একটি উৎসের কাছে গিয়ে সে দাঁড়ালো।
সেই উৎস থেকে জলস্রোত উঠছে যেন তরল আলোক,
প্রভাত যেন হাসি-অশ্রুর গলিত মিলিত গীতধারায় সমুচ্ছল।
নিকটে তালীকুঞ্জতলে একটি পর্ণকুটির
অনির্বচনীয় স্তব্ধতায় পরিবেষ্টিত।
দ্বারে অপরিচিত সিন্ধুতীরের কবি গান গেয়ে বলছে,
মাতা, দ্বার খোলো।

১০

প্রভাতের একটি রবিরশ্মি রুদ্ধদ্বারের নিম্নপ্রান্তে তির্যক হয়ে পড়েছে।
সম্মিলিত জনসংঘ আপন নাড়িতে নাড়িতে যেন শুনতে পেলে
সৃষ্টির সেই প্রথম পরমবাণী, মাতা, দ্বার খোলো।
দ্বার খুলে গেল॥

মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর শিশু,
উষার কোলে যেন শুকতারা।
দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষাপরায়ণ সূর্যরশ্মি শিশুর মাথায় এসে পড়ল।
কবি দিল আপন বীণার তারে ঝংকার, গান উঠল আকাশে,—

জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।
সকলে জানু পেতে বসল রাজা এবং ভিক্ষু, সাধু এবং পাপী,
জ্ঞানী এবং মূঢ়—
উচ্চস্বরে ঘোষণা করলে, জয় হোক মানুষের,
ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের॥

শ্রাবণ, ১৩৩৮

শাপমোচন

গন্ধর্ব সৌরসেন সুরলোকের সংগীতসভায়
কলানায়কদের অগ্রণী।
সেদিন তার প্রেয়সী মধুশ্রী গেছে সুমেরুশিখরে
সূর্যপ্রদক্ষিণে।
সৌরসেনের মন ছিল উদাসী।
অনবধানে তার মৃদঙ্গের তাল গেল কেটে,
উর্বশীর নাচে শমে পড়ল বাধা,
ইন্দ্রাণীর কপোল উঠল রাঙা হয়ে।
স্খলিতছন্দ সুরসভার অভিশাপে
গন্ধর্বের দেহশ্রী বিকৃত হয়ে গেল,
অরুণেশ্বর নাম নিয়ে তার জন্ম হল
গান্ধাররাজগৃহে।
মধুশ্রী ইন্দ্রাণীর পাদপীঠে মাথা রেখে পড়ে রইল,
বললে, "বিচ্ছেদ ঘটিয়ো না,
একই লোকে আমাদের গতি হোক,
একই দুঃখভোগ একই অবমাননায়।"
শচী সকরুণ দৃষ্টিতে ইন্দ্রের পানে তাকালেন।
ইন্দ্র বললেন, "তথাস্তু, যাও মর্তে;
সেখানে দুঃখ পাবে, দুঃখ দেবে।
সেই দুঃখে ছন্দঃপাতন অপরাধের ক্ষয়।"

মধুশ্রী জন্ম নিল মদ্ররাজকুলে, নাম নিল কমলিকা।
একদিন গান্ধারপতির চোখে পড়ল মদ্ররাজকন্যার ছবি।

সেই ছবি তার দিনের চিন্তা, তার রাত্রের স্বপ্নের 'পরে
আপন ভূমিকা রচনা করলে।

গান্ধারের দূত এল মদ্ররাজধানীতে।
বিবাহপ্রস্তাব শুনে রাজা বললে,
"আমার কন্যার দুর্লভ ভাগ্য।"

ফাল্গুন মাসের পুণ্যতিথিতে শুভলগ্ন।
রাজহস্তীর পৃষ্ঠে রত্নাসনে মদ্ররাজসভায়
এসেছে মহারাজ অরুণেশ্বরের অঙ্কবিহারিণী বীণা।
স্তব্ধসংগীতে সেই রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে কন্যার বিবাহ।
যথাকালে রাজবধূ এল পতিগৃহে।
নির্বাণদীপ অন্ধকার ঘরেই প্রতি রাত্রে স্বামীর কাছে বধূসমাগম।
কমলিকা বলে, "প্রভু, তোমাকে দেখবার জন্যে
আমার দিন আমার রাত্রি উৎসুক। আমাকে দেখা দাও।"
রাজা বলে, "আমার গানেই তুমি আমাকে দেখো।"
অন্ধকারে বীণা বাজে।
অন্ধকারে গান্ধর্বীকলার নৃত্যে
বধূকে বর প্রদক্ষিণ করে।
সেই নৃত্যকলা নির্বাসনের সঙ্গিনী হয়ে এসেছে
তার মর্তদেহে।
নৃত্যের বেদনা রানীর বক্ষে এসে দুলে দুলে ওঠে,
নিশীথরাত্রে সমুদ্রে জোয়ার এলে
তার ঢেউ যেমন লাগে তটভূমিতে—
অশ্রুতে প্লাবিত করে দেয়॥

একদিন রাত্রির তৃতীয় প্রহরের শেষে
যখন শুকতারা পূর্বগগনে,
কমলিকা তার সুগন্ধি এলোচুলে রাজার দুই পা ঢেকে দিলে,
বললে, "আদেশ করো, আজ উষার প্রথম আলোকে
তোমাকে প্রথম দেখব।"
রাজা বললে, "প্রিয়ে, না-দেখার নিবিড় মিলনকে
নষ্ট কোরো না এই মিনতি।"
মহিষী বললে, "প্রিয়প্রসাদ থেকে
আমার দুই চক্ষু কি চিরদিন বঞ্চিত থাকবে।
অন্ধতার চেয়েও এ যে বড়ো অভিশাপ।"
অভিমানে মহিষী মুখ ফেরালে।
রাজা বললে, "কাল চৈত্রসংক্রান্তি।
নাগকেশরের বনে নিভৃতে সখাদের সঙ্গে আমার নৃত্যের দিন।
প্রাসাদশিখর থেকে চেয়ে দেখো।"
মহিষীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল,
বললে, "চিনব কী করে।"
রাজা বললে, "যেমন খুশি কল্পনা করে নিয়ো;
সেই কল্পনাই হবে সত্য।"

চৈত্রসংক্রান্তির রাত্রে আবার মিলন।
মহিষী বললে, "দেখলাম নাচ। যেন মঞ্জরিত শালতরুশ্রেণীতে
বসন্তবাতাসের মত্ততা।
সকলেই সুন্দর।
যেন ওরা চন্দ্রলোকের শুক্লপক্ষের মানুষ।
কেবল একজন কুশ্রী কেন রসভঙ্গ করলে, ও যেন রাহুর অনুচর।

ওখানে কী গুণে সে পেল প্রবেশের অধিকার।”

রাজা স্তব্ধ হয়ে রইল।

কিছু পরে বললে, “ঐ কুশ্রীর পরম বেদনাতেই তো সুন্দরের আহ্বান।

কালো মেঘের লজ্জাকে সান্ত্বনা দিতেই সূর্যরশ্মি

তার ললাটে পরায় ইন্দ্রধনু,

মরুনীরস কালো মর্তের অভিশাপের উপর স্বর্গের করুণা

যখন রূপ ধরে

তখনই তো শ্যামল সুন্দরের আবির্ভাব।

প্রিয়তমে, সেই করুণাই কি তোমার হৃদয়কে কাল মধুর করেনি।”

“না, মহারাজ, না” ব'লে মহিষী দুই হাতে মুখ ঢাকলে।

রাজার কণ্ঠের সুরে অশ্রুর ছোঁওয়া লাগল।

বললে, “যাকে দয়া করলে হৃদয় তোমার ভরে উঠত

তাকে ঘৃণা ক'রে মনকে কেন পাথর করলে।”

“রসবিকৃতির পীড়া সইতে পারিনে”

এই ব'লে মহিষী আসন থেকে উঠে পড়ল।

রাজা তার হাত ধরলে,

বললে, “একদিন সইতে পারবে

আপনারই আন্তরিক রসের দাক্ষিণ্যে।

কুশ্রীর আত্মত্যাগে সুন্দরের সার্থকতা।”

ভ্রূ কুটিল করে মহিষী বললে,

“অসুন্দরের জন্যে তোমার এই অনুকম্পার অর্থ বুঝিনে।

ঐ শোনো, উষার প্রথম কোকিলের ডাক,

অন্ধকারের মধ্যে তার আলোকের অনুভূতি।

আজ সূর্যোদয়মুহূর্তে তোমারও প্রকাশ হবে

আমার দিনের মধ্যে, এই আশায় রইলাম।”

রাজা বললে, "তাই হোক, ভীরুতা যাক কেটে।"
দেখা হল।
ট'লে উঠল যুগলের সংসার।
"কী অন্যায়, কী নিষ্ঠুর বঞ্চনা"
বলতে বলতে কমলিকা ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গেল॥

গেল বহুদূরে,—
বনের মধ্যে মৃগয়ার জন্যে যে নির্জন রাজগৃহ আছে সেইখানে।
কুয়াশায় শুকতারার মতো লজ্জায় সে আচ্ছন্ন।
রাত্রি যখন দুই প্রহর তখন আধ-ঘুমে সে শুনতে পায়
এক বীণাধ্বনির আর্তরাগিণী।
স্বপ্নে বহুদূরের আভাস আসে;
মনে হয়, এই সুর চিরদিনের চেনা।
রাতের পরে রাত গেল।
অন্ধকারে তরুতলে যে-মানুষ ছায়ার মতো নাচে
তাকে চোখে দেখে না, তাকে হৃদয়ে দেখা যায়,
যেমন দেখা যায় জনশূন্য দেওদারবনের দোলায়িত শাখায়
দক্ষিণসমুদ্রের হাওয়ার হাহাকারমূর্তি।
এ কী হল রাজমহিষীর।
কোন্ হতাশের বিরহ তার বিরহকে জাগিয়ে তোলে।
মাটির প্রদীপশিখায় সোনার প্রদীপ জ্বলে উঠল বুঝি।
রাতজাগা পাখি নিস্তব্ধ নীড়ের পাশ দিয়ে হুহু করে উড়ে যায়;
তার পাখার শব্দে ঘুমন্ত পাখির পাখা উৎসুক হয়ে ওঠে যে।
বীণায় বাজতে থাকে কেদারা, বেহাগ, বাজে কালাংড়া।
আকাশে আকাশে তারাগুলি যেন তামসী তপস্বিনীর নীরব জপমন্ত্র।

রাজমহিষী বিছানার ’পরে উঠে বসে।
স্রস্ত তার বেণী, ত্রস্ত তার বক্ষ।
বীণার গুঞ্জরণ আকাশে মেলে দেয় এক অন্তহীন অভিসারের পথ।
রাগিণীবিছানো সেই শূন্যপথে বেরিয়ে পড়ে তার মন।
কার দিকে ? দেখার আগে যাকে চিনেছিল তারই দিকে।
একদিন নিমফুলের গন্ধ অন্ধকার ঘরে
অনির্বচনীয়ের আমন্ত্রণ নিয়ে এসেছে।
মহিষী বিছানা ছেড়ে বাতায়নের কাছে এসে দাঁড়ালো।
নিচে সেই ছায়ামূর্তির নৃত্য, বিরহের সেই ঊর্মিদোলা।
মহিষীর সমস্ত দেহ কম্পিত।
ঝিল্লিঝংকৃত রাত, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ দিগন্তে।
অস্পষ্ট আলোয় অরণ্য স্বপ্নে কথা কইছে।
সেই বোবা বনের ভাষাহীন বাণী লাগল রাজমহিষীর অঙ্গে অঙ্গে।
কখন নাচ আরম্ভ হল সে জানে না।
এ নাচ কোন্ জন্মান্তরের, কোন্ লোকান্তরের ॥

গেল আরও দুই রাত।
অভিসারের পথ একান্তই শেষ হয়ে আসছে এই জানলারই কাছে।
সেদিন বীণায় পরজের বিহ্বল মিড়।
কমলিকা আপন মনে নীরবে বলছে,
“ওগো কাতর, ওগো হতাশ, আর ডেকো না।
আমার আর দেরি নেই।”

কিন্তু যাবে কার কাছে।
চোখে না দেখেছিল যাকে তারই কাছে তো।

কেমন করে হবে।

দেখা-মানুষ আজ না-দেখা মানুষকে ছিনিয়ে নিয়ে
পাঠিয়ে দিলে সাতসমুদ্রপারে, রূপকথার দেশে।
সেখানকার পথ কোন্ দিকে ?
আরও এক রাত যায়।
কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ ডুবেছে অমাবস্যার তলায়।
আঁধারের ডাক কী গভীর।
পথ-না-জানা যত-সব গুহাগহ্বর মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন।
এই ডাক সেখানে গিয়ে প্রতিধ্বনি জাগায়।
সেই অস্ফুট আকাশবাণীর সঙ্গে মিলে ঐ যে বাজে বীণায় কানাড়া।
রাজমহিষী উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আজ আমি যাব।
আমার চোখকে আমি আর ভয় করিনে।"
পথের শুকনো পাতা পায়ে পায়ে বাজিয়ে দিয়ে
সে গেল পুরাতন অশথগাছের তলায়।
বীণা থামল।
মহিষী থমকে দাঁড়ালো।
রাজা বললে, "ভয় কোরো না প্রিয়ে, ভয় কোরো না।"
তার গলার স্বর জলে-ভরা মেঘের দূর গুরুগুরু ধ্বনির মতো।
"আমার কিছু ভয় নেই, তোমারই জয় হল"
এই বলে মহিষী আঁচলের আড়াল থেকে প্রদীপ বের করলে,
ধীরে ধীরে তুললে রাজার মুখের কাছে।
কণ্ঠ দিয়ে কথা বেরোতে চায় না, পলক পড়ে না চোখে।
বলে উঠল, "প্রভু আমার, প্রিয় আমার,
এ কী সুন্দর রূপ তোমার।"

পৌষ, ১৩৩৮

ছুটি

দাও-না ছুটি,
কেমন করে বুঝিয়ে বলি
কোন্‌খানে।
যেখানে ঐ শিরীষবনের গন্ধপথে
মৌমাছিদের কাঁপছে ডানা সারাবেলা ;
যেখানেতে মেঘ-ভাসা ঐ সুদূরতা ;
জলের প্রলাপ যেখানে প্রাণ উদাস করে
সন্ধ্যাতারা ওঠার মুখে ;
যেখানে সব প্রশ্ন গেছে থেমে,
শূন্য ঘরে অতীত স্মৃতি গুন্‌গুনিয়ে
ঘুম ভাঙিয়ে রাখে না আর
বাদলরাতে।
যেখানে এই মন
গোরুচরা মাঠের মধ্যে স্তব্ধ বটের মতো
গাঁয়ে-চলা পথের পাশে—
কেউ বা এসে প্রহরখানেক
বসে তলায়,
পা ছড়িয়ে কেউ বা বাজায় বাঁশি,
নববধূর পালকিখানা নামিয়ে রাখে
ক্লান্ত দুই পহরে,
কৃষ্ণ একাদশীর রাতে
ছায়ার সঙ্গে ঝিল্লিরবে জড়িয়ে পড়ে

চাঁদের শীর্ণ আলো।
যাওয়া-আসার স্রোত বহে যায়
দিনে রাতে ;
ধ'রে-রাখার নাই কোনো আগ্রহ,
দূরে-রাখার নাই তো অভিমান।
রাতের তারা স্বপ্নপ্রদীপখানি
ভোরের আলোয় ভাসিয়ে দিয়ে
যায় চলে, তার দেয় না ঠিকানা॥

৩১ ভাদ্র, ১৩৩৯

গানের বাসা

তোমরা দুটি পাখি,
মিলনবেলায় গান কেন আজ
মুখে মুখে নীরব হল।
আতশবাজির বক্ষ থেকে
চতুর্দিকে স্ফুলিঙ্গ সব ছিটকে পড়ে,
তেমনি তোমাদের
বিরহতাপ ছড়িয়ে গিয়েছিল
সারারাত্রি সুরে সুরে
বনের থেকে বনে।
গানের মূর্তি নিয়ে তারা পড়ল না তো ধরা—
বাতাস তাদের মিলিয়ে দিল
দিগন্তরের অরণ্যচ্ছায়ায়॥

আমরা মানুষ, ভালোবাসার জন্যে বাসা বাঁধি,
চিরকালের ভিত গড়ি তার গানের সুরে ;
খুঁজে আনি জরাবিহীন বাণী
সে মন্দিরের গাঁথন দিতে।
বিশ্বজনের সবার জন্যে সে গান থাকে
সব প্রেমিকের প্রাণের আসন মেলে দিয়ে।
বিপুল হয়ে উঠেছে সে
দেশে দেশে কালে কালে।
মাটির মধ্যখানে থেকে

মাটিকে সে অনেক দূরে ছাড়িয়ে তোলে মাথা
কল্প স্বর্গলোকে।

সহজ ছন্দে যায় আনন্দে জীবন তোমাদের
উধাও পাখার নাচের তালে।
তুরু তুরু কোমল বুকের প্রেমের বাসা
আপনি আছে বাঁধা
পাখির ভুবনে।
প্রাণের রসে শ্যামল মধুর,
মুখরিত গুঞ্জনে মর্মরে,
ঝলকিত চিকন পাতার দোলনে কম্পনে,
পুলকিত ফুলের উল্লাসে;
নব নব ঋতুর মায়াতুলি
সাজায় তারে নবীন রঙে;
মনে-রাখা, ভুলে-যাওয়া,
যেন দুটি প্রজাপতির মতো
সেই নিভৃতে অনায়াসে হালকা পাখায়
আলোছায়ার সঙ্গে বেড়ায় খেলে॥
আমরা কেবল বানিয়ে তুলি
আপন ব্যথার রঙে রসে
ধূলির থেকে পালিয়ে যাবার সৃষ্টিছাড়া ঠাঁই,
বেড়া দিয়ে আগলে রাখি
ভালোবাসার জন্যে দূরের বাসা।
সেই আমাদের গান॥

৩১ ভাদ্র, ১৩৩৯

পয়লা আশ্বিন

হিমের শিহর লেগেছে আজ মৃদু হাওয়ায়
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।
ভোরবেলাকার চাঁদের আলো
মিলিয়ে আসে শ্বেতকরবীর রঙে।
শিউলিফুলের নিশ্বাস বয়
ভিজে ঘাসের 'পরে,
তপস্বিনী উষার পরা পুজোর চেলির
গন্ধ যেন
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে॥

পুব আকাশে শুভ্র আলোর শঙ্খ বাজে,
বুকের মধ্যে শব্দ যে তার
রক্তে লাগায় দোলা।
কত যুগের কত দেশের বিশ্ববিজয়ী
মৃত্যুপথে ছুটেছিল
অমর প্রাণের অসাধ্য সন্ধানে।
তাদেরই সেই বিজয়শঙ্খ
রেখে গেছে অরব ধ্বনি
শিশিরধোওয়া রোদে।
বাজল রে আজ বাজল রে তার
ঘরছাড়ানো ডাক
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে॥

ধনের বোঝা, খ্যাতির বোঝা, দুর্ভাবনার বোঝা
ধুলোয় ফেলে দিয়ে
নিরুদ্‌বেগে চলেছিল জটিল সংকটে।
ললাট তাদের লক্ষ্য ক'রে
পঙ্কপিণ্ড হেনেছিল
দুর্জনেরা মলিন হাতে ;
নেমেছিল উল্কা আকাশ থেকে,
পায়ের তলায় নীরস নিঠুর পথ
তুলেছিল গুপ্ত ক্ষুদ্র কুটিল কাঁটা।
পায়নি আরাম, পায়নি বিরাম,
চায়নি পিছন ফিরে ;
তাদেরই সেই শুভ্রকেতনগুলি
ঐ উড়েছে শরৎপ্রাতের মেঘে
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে॥

ভয় কোরো না, লোভ কোরো না, ক্ষোভ কোরো না,
জাগো আমার মন,
গান জাগিয়ে চলো সমুখপথে
যেখানে ঐ কাশের চামর দোলে
নবসূর্যোদয়ের দিকে।
নৈরাশ্যের নখর হতে
রক্তঝরা আপ্‌নাকে আজ ছিন্ন করে আনো,
আশার মোহ-শিকড়গুলো উপড়ে দিয়ে যাও,
লালসাকে দলো পায়ের তলায়।

মৃত্যুতোরণ যখন হবে পার
পরাজয়ের গ্লানিভরে মাথা তোমার না হয় যেন নত।
ইতিহাসের আত্মজয়ী বিশ্ববিজয়ী,
তাদের মাভৈঃ বাণী বাজে নীরব নির্ঘোষণে
নির্মল এই শরৎরৌদ্রালোকে,
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে॥

১ আশ্বিন, ১৩৩৯

গ্রন্থপরিচয়

পুনশ্চ কাব্যের প্রথম সংস্করণে সাঁইত্রিশটি কবিতা ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে আরও তেরোটি কবিতা যোগ করা হয়। এই নূতন কবিতার ভিতরে—খেলনার মুক্তি, পত্রলেখা, খ্যাতি, বাঁশি, উন্নতি, ভীরু, এই ছয়টি পরিশেষ কাব্যের প্রথম সংস্করণ হইতে লওয়া হইয়াছে। তীর্থযাত্রী, চিররূপের বাণী, শুচি, রংরেজিনি, মুক্তি, প্রেমের সোনা, স্নানসমাপন, এই সাতটি কবিতা বিভিন্ন সাময়িক পত্র হইতে সংকলিত।

যে ক্ষেত্রে রচনার তারিখ জানা যায় নাই, সাময়িকে প্রকাশ হইতে অনুমান করিয়া সম্ভবপর রচনাকাল বন্ধনীমধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

তীর্থযাত্রী কবিতাটি টি. এস. এলিয়ট্-এর The Journey of the Magi নামক কবিতার অনুবাদ।

শিশুতীর্থ কবিতার গ্রন্থভুক্ত নামটি নূতন। ১৩৩৮, ভাদ্রের বিচিত্রায় শিরোনাম ছিল—সনাতনম্ এনম্ আহুর্ উতাদ্যস্যাং পুনর্নবঃ। অথর্ববেদ।—ইনি সনাতন, ইনিই অদ্য পুনর্নব।

শাপমোচন। রাজা (১৩১৭ পৌষ) নাটকের কথাবস্তুকে নৃত্যনাট্যোপযোগী এই রূপ দেওয়া হইয়াছে। রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে নৃত্যগীতযোগে শান্তিনিকেতন আশ্রমের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা ১৩৩৮ পৌষের ১৫ ও ১৬ তারিখে ইহার প্রথম অভিনয় হয়।

পুনশ্চকাব্য এবং গদ্যকবিতার রীতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যে আলোচনা করিয়াছেন সাহিত্যের স্বরূপ গ্রন্থে—কাব্যে গদ্যরীতি, কাব্য ও ছন্দ, গদ্যকাব্য, এই কয়টি প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। সেই আলোচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।—

৯

কাব্যকে বেড়াভাঙা গদ্যের ক্ষেত্রে স্ত্রীস্বাধীনতা দেওয়া যায় যদি, তাহলে সাহিত্যসংসারের আলংকারিক অংশটা হাল্কা হয়ে তার বৈচিত্র্যের দিক, তার চরিত্রের দিক, অনেকটা খোলা জায়গা পায়। কাব্য জোরে পা ফেলে চলতে পারে। সেটা সযত্নে নেচে চলার চেয়ে সব সময়ে যে নিন্দনীয় তা নয়। নাচের আসরের বাইরে আছে এই উঁচুনিচু বিচিত্র বৃহৎ জগৎ, রূঢ় অথচ মনোহর, সেখানে জোরে চলাটাই মানায় ভালো—কখনো ঘাসের উপর, কখনো কাঁকরের উপর দিয়ে।

…নাচের কথাটা যখন উঠল ওটাকে সেরে নেওয়া যাক। নাচের জন্য বিশেষ সময়, বিশেষ কায়দা চাই। চারিদিক বেষ্টন করে আলোটা মালাটা দিয়ে তার চালচিত্র খাড়া না করলে মানানসই হয় না। কিন্তু এমন মেয়ে দেখা যায় যার সহজ চলনের মধ্যেই বিনা ছন্দের ছন্দ আছে। কবিরা সেই অনায়াসের চলন দেখেই নানা উপমা খুঁজে বেড়ায়। সে-মেয়ের চলনটাই কাব্য, তাতে নাচের তাল নাই বা লাগল; তার সঙ্গে মৃদঙ্গের বোল দিতে গেলে বিপত্তি ঘটবে। তখন মৃদঙ্গকে দোষ দেব না তার চলনকে? সেই চলন নদীর ঘাট থেকে আরম্ভ করে রান্নাঘর বাসরঘর পর্যন্ত। তার জন্যে মালমসলা বাছাই করে বিশেষ ঠাট বানাতে হয় না। গদ্যকাব্যেরও এই দশা। সে নাচে না, সে চলে। সে সহজে চলে ব'লেই তার গতি সর্বত্র। সেই গতিভঙ্গি আবাঁধা। ভিড়ের ছোঁওয়া বাঁচিয়ে পোশাকি-শাড়ির-প্রান্ত-তুলে-ধরা আধঘোমটা-টানা সাবধান চাল তার নয়।

এই গেল আমার পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থের কৈফিয়ত। আরও একটা পুনশ্চ-নাচের আসরে নাট্যাচার্য হয়ে বসব না, এমন পণ করিনি। কেবলমাত্র কাব্যের অধিকারকে বাড়াব মনে ক'রেই একটা দিকের বেড়ায় গেট বসিয়েছি।… যাঁরা দৈবদুর্যোগে মনে করবেন, গদ্যে কাব্যরচনা সহজ, তাঁরা এই খোলা দরজাটার কাছে ভিড় করবেন সন্দেহ নেই। তা নিয়ে ফৌজদারি বাধলে আমাকে স্বদলের লোক বলে স্বপক্ষে সাক্ষী মেনে বসবেন। সেই দুর্দিনের পূর্বেই নিরুদ্দেশ হওয়া ভালো। দেওয়ালি, ১৩৩৯

ছন্দটাই যে ঐকান্তিকভাবে কাব্য তা নয়। কাব্যের মূল কথাটা আছে রসে, ছন্দটা এই রসের পরিচয় দেয় তার আনুষঙ্গিক হয়ে।

সহায়তা করে দুই দিক থেকে। এক হচ্ছে স্বভাবতই তার দোলা দেবার শক্তি আছে, আর-এক হচ্ছে পাঠকের চিরাভ্যস্ত সংস্কার। এই সংস্কারের কথাটা ভাববার বিষয়। একদা নিয়মিত অংশে বিভক্ত ছন্দই সাধু কাব্যভাষায় একমাত্র পাংক্তেয় বলে গণ্য ছিল। সেই সময়ে আমাদের কানের অভ্যাসও ছিল তার অনুকূলে। তখন ছন্দে মিল রাখাও ছিল অপরিহার্য।

এমন সময়ে মধুসূদন বাংলাসাহিত্যে আমাদের সংস্কারের প্রতিকূলে আনলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ। তাতে রইল না মিল। তাতে লাইনের বেড়াগুলি সমানভাগে সাজানো বটে, কিন্তু ছন্দের পদক্ষেপ চলে ক্রমাগতই বেড়া ডিঙিয়ে। অর্থাৎ, এর ভঙ্গি পদ্যের মতো কিন্তু ব্যবহার গদ্যের চালে।

...অমিত্রাক্ষর ছন্দের মিলবর্জিত অসমানতাকে কেউ কাব্যরীতির বিরোধী বলে আজ মনে করেন না। অথচ পূর্বতন বিধানকে এই ছন্দ বহুদূরে লঙ্ঘন করে গেছে।

কাজটা সহজ হয়েছিল কেননা তখনকার ইংরেজি-শেখা পাঠকেরা মিল্টন শেক্‌স্পীয়রের ছন্দকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অমিত্রাক্ষর ছন্দকে জাতে তুলে নেবার প্রসঙ্গে সাহিত্যিক সনাতনীরা এই কথা বলবেন যে, যদিও এই ছন্দ চোদ্দ অক্ষরের গণ্ডিটা পেরিয়ে চলে তবু সে পয়ারের লয়টাকে অমান্য করে না।

অর্থাৎ, লয়কে রক্ষা করার দ্বারা এই ছন্দ কাব্যের ধর্ম রক্ষা করেছে, অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে এইটুকু বিশ্বাস লোকে আঁকড়ে রয়েছে। তারা বলতে চায়, পয়ারের সঙ্গে এই নাড়ীর সম্বন্ধটুকু না থাকলে কাব্য কাব্যই হতে পারে না। কী হতে পারে এবং হতে পারে না তা হওয়ার উপরেই নির্ভর করে, লোকের অভ্যাসের উপর করে না— এ-কথাটা অমিত্রাক্ষর ছন্দই পূর্বেই প্রমাণ করেছে। আজ গদ্যকাব্যের উপরে প্রমাণের ভার পড়েছে যে, গদ্যেও কাব্যের সঞ্চরণ অসাধ্য নয়।

অশ্বারোহী সৈন্যও সৈন্য, আবার পদাতিক সৈন্যও সৈন্য—কোন্‌খানে তাদের মূলগত মিল? যেখানে লড়াই ক'রে জেতাই তাদের উভয়েরই সাধনার লক্ষ্য। কাব্যের লক্ষ্য হৃদয় জয় করা— পদ্যের ঘোড়ায় চড়েই হোক আর গদ্যে পা চালিয়েই হোক। সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির সক্ষমতার দ্বারাই তাকে বিচার করতে হবে। হার হলেই হার, তা সে ঘোড়ায় চড়েই হোক আর পায়ে হেঁটেই হোক। ছন্দে-লেখা রচনা কাব্য হয়নি, তার হাজার প্রমাণ আছে; গদ্যরচনাও কাব্য নাম ধরলেও কাব্য হবে না, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ জুটতে থাকবে।

গদ্যই হোক পদ্যই হোক রসরচনামাত্রেই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত। সেই নিগূঢ় ছন্দটিকে পীড়ন করলেই কাব্যকে আহত করা হয়। পদ্যছন্দবোধের চর্চা বাঁধা-নিয়মের পথে চলতে পারে কিন্তু গদ্যছন্দের পরিমাণবোধ মনের মধ্যে যদি সহজে না থাকে তবে অলংকার শাস্ত্রের সাহায্যে এর দুর্গমতা পার হওয়া যায় না। অথচ অনেকেই মনে রাখেন না যে, যেহেতু গদ্য সহজ, সেই কারণেই গদ্যছন্দ সহজ নয়। ১২ নভেম্বর, ১৯৩৬

৩

অলংকরণের বহিরাবরণ থেকে মুক্ত ক'রে কাব্য সহজে আপনাকে প্রকাশ করতে পারে, এ বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেব। ·· জবালাপুত্র সত্যকামের কাহিনী অবলম্বন ক'রে আমি একটি কবিতা রচনা করেছি। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই গল্পটি সহজ গদ্যের ভাষায় পড়েছিলাম, তখন তাকে সত্যিকার কাব্য ব'লে মেনে নিতে একটুও বাধেনি। উপাখ্যান-মাত্র— কাব্যবিচারক একে বাহিরের দিকে তাকিয়ে কাব্যের পর্যায়ে স্থান দিতে অসম্মত হতে পারেন; কারণ এ তো অনুষ্টুভ ত্রিষ্টুভ বা মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত হয়নি। আমি বলি, হয়নি ব'লেই শ্রেষ্ঠ কাব্য হতে পেরেছে, অপর কোনো আকস্মিক কারণে নয়। এই সত্যকামের গল্পটি যদি ছন্দে বেঁধে রচনা করা হত তবে হালকা হয়ে যেত।

সপ্তদশ শতাব্দীতে নাম-না জানা কয়েকজন লেখক ইংরেজিতে গ্রীক ও হিব্রু বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন। এ কথা মানতেই হবে যে, সলোমনের গান,

ডেভিডের গাথা সত্যিকার কাব্য। এই অনুবাদের ভাষার আশ্চর্য শক্তি এদের মধ্যে কাব্যের রস ও রূপকে নিঃসংশয়ে পরিস্ফুট করেছে। এই গানগুলিতে গদ্যছন্দের যে মুক্ত পদক্ষেপ আছে তাকে যদি পদ্যপ্রথার শিকলে বাঁধা হত তবে সর্বনাশই হত।...

রুচিভেদ নিয়ে তর্ক করে কিছু লাভ হয় না। এইমাত্রই বলতে পারি, আমি অনেক গদ্যকাব্য লিখেছি যার বিষয়বস্তু অপর কোনো রূপে প্রকাশ করতে পারতুম না। তাদের মধ্যে একটা সহজ প্রাত্যহিক ভাব আছে; হয়তো সজ্জা নেই, কিন্তু রূপ আছে এবং এইজন্যেই তাদেরকে সত্যকার কাব্যগোত্রীয় বলে মনে করি। কথা উঠতে পারে, গদ্যকাব্য কী। আমি বলব কী ও কেমন জানি না, জানি যে, এর কাব্যরস এমন একটা জিনিস যা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করবার নয়। যা আমাকে বচনাতীতের আস্বাদ দেয় তা গদ্য বা পদ্য-রূপেই আসুক তাকে কাব্য বলে গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ হব না। ২৯ অগস্ট, ১৯৩৯

পুনশ্চ কাব্যের কতকগুলি কবিতার পূর্বাভাস যে যে লেখায় পাওয়া যায় কবির বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে পরে তাহা উদ্ধৃত হইল। এই গ্রন্থে পৃষ্ঠাসংখ্যা, কবিতার নাম ও উহার রচনাকাল প্রত্যেক প্রসঙ্গের প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে।

পৃ ১৭। নাটক। ৯ ভাদ্র ১৩৩৯। আখ্যান অংশটুকু বাদে এই কবিতা পথে ও পথের প্রান্তে পুস্তকের উনচল্লিশসংখ্যক[১] পত্রের সহিত তুলনীয়। পত্রের আলোচ্য বিষয় তপতী নাটক, প্রকাশের পূর্বে একসময় উহারই সুমিত্রা নাম কল্পিত হইয়াছিল। নিম্নে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত হইল।—

গতকল্য আমার লেখনী একটি সর্বাঙ্গসুন্দর নাটককে জন্ম দিয়েছে; দশমাস তার গর্ভবাস হয়নি, বোধ করি দিন-দশকের বেশি সময় নেয়নি। 'সর্বাঙ্গসুন্দর' বিশেষণটা পড়ে হয়তো তোমার ওষ্ঠাধর হাস্যকুটিল হয়ে উঠবে।...কেটে সংশোধন করা অসম্ভব ছিল না কিন্তু ভেবে দেখলুম, যেটাকে সত্য ব'লে বিশ্বাস করি সেইটেই লেখা হয়ে গেছে। বিনয়টাকে তখনই সদ্‌গুণ বলতে রাজি আছি যখন সেটা অসত্য নয়। তোমরা বলবে, নিজের লেখা সম্বন্ধে সত্য

১ শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত।

নির্ণয় করা লেখকের পক্ষে সহজ নয়। সে কথা যদি বল তাহলে কোনো লেখা সম্বন্ধে সুনিশ্চিতভাবে সত্য নির্ণয় কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।... যেদিন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' প্রথম লিখেছিলেম সেদিন ওটা লিখে আনন্দে বিস্মিত হয়েছিলুম—আজ ওটাকে যদি কোনো নির্মলনলিনী দেবীর নামে চালিয়ে দিতে পারতুম কিছুমাত্র দুঃখিত হতুম না, এমনকি অনেকখানিই আরাম পাওয়া যেত। এমন অবস্থায় নাহয় আজ যেটা ভালো লেগেছে আজই সেটাকে অসংকোচে ভালো বলাই গেল।... অতএব খুব জোরের সঙ্গেই বলব, নাটকটা সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে।

ঠিক এইখানটাতে খুব একটা ঘুমের বেগ এসে পড়ল মাথার মধ্যে, হঠাৎ প্রবল বর্ষণে যেমন চারদিক থেকে ঘোলা জলের ধারা নেমে আসে সেইরকমটা। বুদ্ধিটা একেবারেই স্বচ্ছ রইল না। অনেক সময়ে তৎসত্ত্বেও যে-কাজটা হাতে নেওয়া গেছে সেটা আমি জোর ক'রে সেরে ফেলি— টলমল করতে করতেই লেখা চলে, ক'ষে মদ খেয়ে নাচতে গেলে যেরকমটা হয়।...জাহাজ যেমন কুয়াশার ভিতর দিয়েও গম্য স্থানের দিকে এগোয় আমার লেখাও তেমনি কল একেবারে বন্ধ করে না। যাকৃগে। বিষয়টা ছিল আমার নতুন নাটক-রচনা। 'সুমিত্রা' নামই ঠিক করেছি। ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যেন আমি নেড়া ছন্দে ব্ল্যাঙ্ক্ ভার্সে নাটক লিখি। আমি স্পষ্টই দেখলুম, গদ্যে তার চেয়ে ঢের বেশি জোর পাওয়া যায়। পদ্য জিনিসটা সমুদ্রের মতো, তার যা বৈচিত্র্য তা প্রধানত তরঙ্গের; কিন্তু গদ্যটা স্থলদৃশ্য, তাতে নানা মেজাজের রূপ আনা যায়— অরণ্য, পাহাড়, মরুভূমি, সমতল, অসমতল, প্রান্তর, কান্তার ইত্যাদি ইত্যাদি। সাহিত্যে পদ্যটাও প্রাচীন; গদ্য ক্রমে ক্রমে জেগে উঠছে, তাকে ব্যবহার করা, অধিকার করা সহজ নয়; সে তার আপন বেগে ভাসিয়ে নিয়ে যায় না, নিজের শক্তি প্রয়োগ করে তার উপর দিয়ে চলতে হয়। ২৩ শ্রাবণ, ১৩৩৬

পৃ ৪১। বাসা। ৩ ভাদ্র, ১৩৩৯। এই কবিতার সহিত তৃতীয়খণ্ড চিঠিপত্রে ছত্রিশসংখ্যক চিঠি[১]র কিয়দংশ তুলনার যোগ্য।—

থেকে থেকে মনে আসচে তোমার সেই স্টু্ডিয়োর কথাটা। ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে শালবনের ছায়ায়, খোলা জানলার কাছে। বাইরে একটা তালগাছ

১ শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুরকে লিখিত।

খাড়া দাঁড়িয়ে, তারই পাতাগুলোর কম্পমান ছায়া সঙ্গে নিয়ে রোদ্দুর এসে পড়েচে আমার দেয়ালের উপর; জামের ডালে বসে ঘুঘু ডাকচে সমস্ত দুপুরবেলা; নদীর ধার দিয়ে একটা ছায়াবীথি চলে গেছে—কুড়চি ফুলে ছেয়ে গেছে গাছ, বাতাবি নেবুর ফুলের গন্ধে বাতাস ঘন হয়ে উঠেচে, জারুল পলাশ মাদারে চলেচে প্রতিযোগিতা, সজনে ফুলের ঝুরি দুলচে হাওয়ায়; অশথ গাছের পাতাগুলো ঝিল্‌মিল্ ঝিল্‌মিল্ করচে; আমার জানলার কাছ পর্যন্ত উঠেচে চামেলিলতা। নদীতে নেবেচে একটি ছোটো ঘাট, লাল পাথরে বাঁধানো; তারই একপাশে একটি চাঁপার গাছ। একটির বেশি ঘর নেই। শোবার খাট দেয়ালের গহ্বরের মধ্যে ঠেলে দেওয়া যায়। ঘরে একটিমাত্র আছে আরামকেদারা—মেঝেতে ঘন লাল রঙের জাজিম পাতা; দেয়াল বসন্তী রঙের, তাতে ঘোর কালো রেখার পাড় আঁকা। ঘরের পুবদিকে একটুখানি বারান্দা; সূর্যোদয়ের আগেই সেইখানে চুপ করে গিয়ে বসব, আর খাবার সময় হলে লীলমণি সেইখানে খাবার এনে দেবে। একজন কেউ থাকবে যার গলা খুব মিষ্টি, যে আপন মনে গান গাইতে ভালোবাসে। পাশের কুটিরে তার বাসা; যখন খুশি সে গান করবে, আমার ঘরের থেকে শুনতে পাব। তার স্বামী ভালোমানুষ এবং বুদ্ধিমান, আমার চিঠিপত্র লিখে দেয়, অবকাশকালে সাহিত্য আলোচনা করে, এবং ঠাট্টা করলে ঠাট্টা বুঝতে পারে এবং যথোচিত হাসে। নদীর উপরে দুটি সাঁকো থাকবে; নাম দিতে পারব জোড়াসাঁকো; সেই সাঁকোর দুই প্রান্ত বেয়ে জুঁই বেল রজনীগন্ধা রক্তকরবী। নদীর মাঝে মাঝে গভীর জল; সেইখানে ভাসচে রাজহাঁস, আর ঢালু নদীতটে চ'রে বেড়াচ্চে আমার পাটল রঙের গাই গোরু তার বাছুর নিয়ে। শাকশবজির খেত আছে, বিঘে দুইয়েক জমিতে ধানও কিছু হয়। খাওয়াদাওয়া নিরামিষ, ঘরে-তোলা মাখন দই ছানা ক্ষীর; কুকারে যা রাঁধা যেতে পারে তাই যথেষ্ট; রান্নাঘর নেই। থাক্ এই পর্যন্ত। বাইরের দিকে চেয়ে মনে পড়চে, আছি বার্লিনে বড়োলোক সেজে, বড়ো কথা বলতে হবে, বড়ো খ্যাতির বোঝা বয়ে চলতে হবে দিনের পর দিন, জগৎজোড়া সব সমস্যা রয়েচে তর্জনী তুলে, তার জবাব চাই। ওদিকে ভারতসাগরের তীরে অপেক্ষা করে আছে বিশ্বভারতী—তার অনেক দাবি, অনেক দায়; ভিক্ষা করতে হবে দেশে দেশান্তরে। অতএব থাক্ আমার স্টুডিয়ো। ১৮ অগস্ট, ১৯৩০

পৃ. ৪৭। সুন্দর। ৭ ভাদ্র, ১৩৩৯। ইহার সহিত পথে ও পথের প্রান্তে গ্রন্থের ছত্রিশসংখ্যক পত্র[১] তুলনীয়।—

প্ল্যাটিনমের আঙটির মাঝখানে যেন হীরে, আকাশের দিগন্ত ঘিরে মেঘ জমেছে; তার মাঝখানের ফাঁক দিয়ে রোদ্দুর পড়েছে পরিপুষ্ট শ্যামল পৃথিবীর উপরে। আজ আর বৃষ্টি নেই। হুহু করে হাওয়া দিচ্ছে, সামনে পেঁপে গাছের পাতা কাঁপছে; আরো দূরে উত্তরে মাঠে আমার পঞ্চবটীর নিমগাছের ডালে ডালে চলছে আন্দোলন; আর তার পিছনে একা দাঁড়িয়ে আছে তালগাছ, তার মাথায় যেন বিস্তর বকুনি। বেলা এখন আড়াইটে। আমার আবার দৃশ্যপরিবর্তন হয়েছে—উদয়নের দোতলায় বসবার ঘরের পশ্চিম পাশে যে নাবার ঘর ছিল প্রোমোশন হয়ে সেটাই হয়েছে বসবার ঘর, তার পাশের ছাতটুকুতে নাবার ঘরের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। মস্ত একটা টেবিল পেতে বসেছি—পিছনে দক্ষিণ দিকের আকাশ, সামনে উত্তর দিকের। আষাঢ় মাসের স্নাননির্মল স্নিগ্ধ মধ্যাহ্নটি এই দুদিকের খোলা জানলা দিয়ে আমার এই নির্জন ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। মনে মনে ভাবছি, কেন এমন দিনে বহু আগেকার দিনের একটা আভাস চিত্ত-আকাশের দিক্‌প্রান্তে অদৃশ্য কোন্ রাখালের মতো মুলতানে বাঁশি বাজায়। অর্থাৎ, এরকম দিন যেন বর্তমানের কোনো দায়কে স্বীকার করে না, এর কাছে জরুরি কিছুই নেই—যেসব দিন একেবারে চলে গেছে এ তারই মতো বর্তমানভবিষ্যতের বাঁধনছেঁড়া উদাসী, কারও কাছে কোনো জবাবদিহির ধার ধারে না। কিন্তু এই অতীত বস্তুত কোনোদিনই ছিল না—যা ছিল তা বর্তমান, তার প্রত্যেক মুহূর্ত বোঝা পিঠে সার বেঁধে চলেছিল, তার হিসেব দিতে হয়েছে। 'গতকাল' ব'লে যে অতীত সে আজই আছে, গতকাল সে ছিলই না। স্বপ্নরূপিনী সে, বর্তমানের বাঁ পাশে বসে আছে—মধুর হয়ে উঠতে তার কোনো খরচ নেই। সেই জন্যেই বর্তমান কালের মধ্যে যখন কোনো একটা দিনের বিশুদ্ধ সুন্দর চেহারা দেখি তখন বলি, সে অতীত কালের সাজ প'রে এসেছে— প্রেয়সীকে বলি "তুমি যেন আমার জন্মান্তরের জানা" অর্থাৎ এমন কালের জানা যে কাল সকল কালের অতীত,

১ শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত।

যে কালে স্বর্গ, যে কালে সত্যযুগ, যে কাল চিরঅনায়ত্ত। আজকের এই যে সোনায়-পান্নায়-ছায়ায়-আলোয়-বিজড়িত সুগভীর অবকাশের মধুতে ভরা মধ্যাহ্নটি সুদূরবিস্তৃত সবুজ মাঠের উপর বিহ্বল হয়ে পড়ে আছে, এর অনুভূতির মধ্যে একটা বেদনা এই আছে যে, একে পাওয়া যায় না, ছোঁয়া যায় না, সংগ্রহ করা যায় না, অর্থাৎ এ আছে তবুও নেই। সেইজন্যেই একে দূর অতীতের ভূমিকার মধ্যে দেখি। সেই অতীতের যা মাধুরী তা বিশুদ্ধ; সেই অতীতে যা হারিয়েছে বলে নিশ্বাস ফেলি তার সঙ্গে এমন আরও অনেক হারিয়েছে যা সুন্দর নয়, সুখকর নয়—কিন্তু সেগুলি অতীত নয়, তা বিনষ্ট। যা সুন্দর, যা সুখের তাই চির অতীত, তা কোনোদিন মরে না অথচ তার মধ্যে অস্তিত্বের কোনো ভার নেই। আজকের এই দিনটা সেই রকমের—এ আছে তবু নেই, এই মধ্যাহ্নের উপর বিশ্বভারতীর কোনো দাবি নেই; এ গৌড়সারঙ্গের আলাপ, যখন সমাপ্ত হয়ে যাবে তখন হিসাবের খাতায় কোনো অঙ্ক রেখে যাবে না। ৩২ আষাঢ় ১৩৩৬

পৃ. ৫৩। বিচ্ছেদ। ৭ ভাদ্র, ১৩৩৯। ইহার সহিত পথে ও পথের প্রান্তে গ্রন্থের আটত্রিশসংখ্যক পত্র[১] তুলনীয়।—

সকাল থেকেই আজ বাদলা। চারিদিক ঝাপসা। ঘোর ঘনঘটা বললে যা বোঝায় তা নয়। মেঘদূত যেদিন লেখা হয়েছিল সেদিন পাহাড়ের উপর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। সেদিনকার নববর্ষায় আকাশে বাতাসে চলার কথাটাই ছিল বড়ো। দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটেছিল মেঘ, পুবে হাওয়া বয়েছিল 'শ্যামজম্বুবনান্ত'কে দুলিয়ে দিয়ে; যক্ষনারী বলে উঠেছিল, "মা গো! পাহাড়সুদ্ধ উড়িয়ে নিলে বুঝি।" তাই মেঘদূতে যে বিরহ সে ঘরে বসে থাকার বিরহ নয়, সে উড়ে চলে যাওয়ার বিরহ। তাই তাতে দুঃখের ভার নেই বললেই হয়; এমনকি, তাতে মুক্তির আনন্দ আছে। প্রথম বর্ষাধারায় যে পৃথিবীকে উচ্ছল ঝরনায়, উদ্‌বেল নদীস্রোতে, মুখরিত বনবীথিকায় সর্বত্র জাগিয়ে তুলেছে সেই পৃথিবীর বিপুল জাগরণের সুরে লয়ে যক্ষের বেদনা মন্দাক্রান্তা ছন্দে নৃত্য করতে করতে চলেছে। মিলনের দিনে মনের সামনে এত বড়ো বিচিত্র পৃথিবীর ভূমিকা ছিল

১ শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত।

না। ছোটো তার বাসকক্ষ, নিভৃত, কিন্তু বিচ্ছেদ পেয়েছে ছাড়া নদী গিরি অরণ্যশ্রেণীর মধ্যে। মেঘদূতে তাই কান্না নেই, উল্লাস আছে। যাত্রা যখন শেষ হল, মন যখন কৈলাসে পৌঁছেছে তখনই যেন সেখানকার নিশ্চল নিত্য ঐশ্বর্যের মধ্যেই ব্যথার রূপ দেখা গেল ; কেননা, সেখানে কেবলই প্রতীক্ষা। এর মধ্যে একটা স্বতোবিরুদ্ধ তত্ত্ব দেখতে পাই। অপূর্ণ যাত্রা করে চলেছে পূর্ণের অভিমুখে ; চলেছে ব'লেই তার বিচ্ছেদ নব নব পর্যায়ে গভীর একটা আনন্দ পায় কিন্তু যে পরিপূর্ণ সে তো চলে না, সে চিরযুগ প্রতীক্ষা করে থাকে—তার নিত্যপুষ্প, নিত্য দীপালোক, কিন্তু সে নিত্যই একা, সেই হচ্ছে যথার্থ বিরহী। সুর বাঁধার মধ্যেও বীণায় সংগীতের উপলব্ধি পর্বে পর্বে শুরু হয়েছে, কিন্তু অগীত সংগীত অসীম অব্যক্তির মধ্যে অপেক্ষা ক'রেই আছে। যে অভিসারিকা তারই জিত, কেননা আনন্দে সে কাঁটা মাড়িয়ে চলে। কিন্তু বৈষ্ণব এইখানে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলবে, যাঁর জন্যে অভিসার তিনিও থেমে নেই, সমস্তক্ষণ বাঁশি বাজাচ্ছেন, প্রতীক্ষার বাঁশি—তাই অভিসারিণীর চলা আর বাঞ্ছিতের আহ্বান পদে পদেই মিলে যাচ্ছে ; তাই নদী চলেছে যাত্রার সুরে, সমুদ্র দুলছে আহ্বানের ছন্দে ; বিশ্বজোড়া বিচ্ছেদের আসর মিলনের গানে জমজমাট হয়ে উঠেছে—অথচ পূর্ণ অপূর্ণের সে মিলন কোনোদিন বাস্তবের মধ্যে ঘটছে না, সে আছে ভাবের মধ্যে। বাস্তবের মধ্যে ঘটলে সৃষ্টি থাকত না ; কেননা, সৃষ্টির মর্মকথাই হচ্ছে চির-অভিসার চির-প্রতীক্ষার দ্বন্দ্ব। এভোলুশ্যন বলতে তাই বোঝায়। যাকগে, আমার বলবার কথা ছিল, বাদলার দিন মেঘদূতের দিন নয়, এ যে অচলতার দিন— মেঘ চলছে না, হাওয়া চলছে না, বৃষ্টি যে চলছে তা মনে হয় না, ঘোমটার মতো দিনের মুখ আবৃত করেছে। প্রহর চলছে না, বেলা কত হয়েছে বোঝা যায় না। সুবিধা এই যে, চারিদিকে বৃহৎ মাঠ, অবারিত আকাশ, প্রশস্ত অবকাশ। ৮ শ্রাবণ, ১৩৩৬

SCHOOL OF ORIENTAL & AFRICAN STUDIES LONDON

মূল্য দুই টাকা